স্বর্গের খুব কাছে

স্বাতী ও শুদ্ধশীল বসুকে

১

একটু আগে রোদ্দুর ছিল, হঠাৎ ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ছুটে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা চিনার গাছের নীচে দাঁড়ালাম।

রোদ্দুরে হেঁটে আসার সময় একটা চিনচিনে গরমভাব ছিল, বৃষ্টি শুরু হতেই শীত লাগল একটু একটু। কোন গরম জামা আনিনি। বৃষ্টির মিহিন গুঁড়ো ঠিক অভ্রের মতন গুঁড়ে। চিনার গাছের ওপরের ঘন আড়াল থেকে ডেকে ওঠে দুটো পাখি। ঐ পাখিগুলোকে আমি চিনি না, খানিকটা মাছরাঙার মতন দেখতে। মাছরাঙার ডাক কিন্তু অনেকটা শাকচুন্নীদের মতন, এমন ভরাট নয়।

বৃষ্টি আরো ঝেপে এল। এখন আর অভ্রের গুঁড়ো নয়, কালো অ্যাসফল্ট বাঁধানো রাস্তার ওপরে চটাস চটাস শব্দে জুই ফুলের মতন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। কলকাতা হলে এরকম বৃষ্টির মধ্যেও দৌড়ে চলে যেতাম। কিন্তু এখানে একবার মাথা ও গা ভিজে গেলে চট করে ঠাণ্ডা বসে যায়। আর পাহাড়ী জায়গার সর্দি মানেই দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগ।

আমার সামনের রাস্তা দিয়ে ধীর পদক্ষেপে হেঁটে গেল নীল রেনকোট পরা একজন মানুষ। ওকে চেনা চেনা মনে হল। খুব সম্ভবত ড্রিম ফ্লাওয়ার বোটের মির্জা আলী। ছিপছিপে লম্বা, তীক্ষ্ণ নাক, গাঢ় ভুরু। ঠিক যেন একটি তরুণ অশ্বের মতন চেহারা। ঘোড়ার সঙ্গে মানুষের চেহারার কোন মিল হতেই পারে না। তবু মির্জা আলীকে দেখে সেই কথাই আমার মনে হয়। এমন রূপবান পুরুষ আমি খুব কম দেখেছি। অথচ লোকটি নিরক্ষর এবং এমনই বিনীত যে কাপুরুষ বলে ভ্রম হয়। তবু সুন্দর চেহারার একটা আলাদা মূল্য আছেই, আমি মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকি ঐ অপসৃয়মাণ মানুষটির দিকে। নীল রঙের রেনকোটটার জন্য ওকে আজ আরো সুদৃশ্য দেখাচ্ছে—ওরকম রেনকোট এদেশে পাওয়া যায় না, নিশ্চয়ই কোন সাহেব ওকে ওটা দান করে গেছে। আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মির্জা আলীর চেহারাটা একটু খারাপ হলে কোন ক্ষতি ছিল না, তার বদলে আমার চেহারাটা কী একটু ভালো হতে পারত না? শুধু চেহারার জন্যই প্রথম পরিচয়ে কেউ আমাকে গ্রাহ্যই করে না।

ছাতা নিয়ে বেরুনো অভ্যেস নেই কোনদিন। অনেকবার ভেবেছি একটা

রেনকোট কেনার কথা। কেন জানি না আমার ধারণা, রেনকোট পরলেই যে-কোন মানুষকে কোন ডিটেকটিভ বইয়ের চরিত্র বলে মনে হয়। অবশ্য মির্জা আলীকে সে রকম মনে হবার কোন উপায় নেই, ওর মধ্যে রহস্য নেই কোন।

এবার যাচ্ছে দুটি মেম। এদেরও সঙ্গে রেনকোট। তবু এদের পদক্ষেপ বেশ দ্রুত। আহা, এরা তো আর কালিদাসের কাব্য পড়েনি, তাই জানে না যে শ্রোণীভারে অলস-গমনা হওয়া সুন্দরীদের একটি লক্ষণ। দুর্ভাগা করে পশ্চিমে জন্মেছে, তাই এসব আর জানবে কী করে? মেয়ে দুটি ইওরোপীয়ান, না আমেরিকান? অনেকটা বিনা প্রমাণেই ওদের জার্মান বলে সন্দেহ হয় আমার। ক'দিন ধরেই, আমার নিজের দেশ ভারতবর্ষে বসেই আমি জার্মান আতঙ্কে ভুগছি।

বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। আর দেরি করা উচিত নয়। টেনে দৌড় লাগালাম, তথাকথিত জার্মান মেয়ে দুটিকে পেরিয়ে আমি পৌঁছে গেলাম টুরিস্ট সেন্টারে।

প্রথমেই একবার উঁকি দিলাম চিঠির খোপগুলোতে। কারুর চিঠি লেখার কথা নেই, কেউ হঠাৎ লিখবে না জানি, তবু চিঠির জন্য একটা অসম্ভব লোভ থাকে। যদি সম্পূর্ণ অচেনা কেউ চিঠি লিখে জানতে চায়, তুমি কেমন আছো?

আমার নামে চিঠি নেই, তবু আমার নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে যত লোকের পোস্টকার্ডে চিঠি এসেছে সেগুলো পড়ে পড়ে দেখতে লাগলাম। তেমন চিত্তাকর্ষক কিছুই নেই। একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে আছে দু'দিন থেকে। সেটা একবার খুলে দেখার দুর্দান্ত কৌতূহল হল। হয়তো কোন সাঙ্ঘাতিক খবর আছে এর মধ্যে, কিন্তু যার নামে টেলিগ্রাম, সে হয়তো গিয়ে বসে আছে গুলমার্গে।

তিন নম্বর কাউন্টারের সামনে একটু একটু গোলমাল শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ একজন মহিলা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ইয়েস, আই অ্যাম মিসেস চ্যাটার্জি! আপনি তার কি কোন প্রমাণ চান?

বাঙালি নাম শুনে ফিরে তাকাতেই হল। কাউন্টারের সামনে সাদা রঙের সিল্কের শাড়ি, তার ওপর সাদা চাদর জড়ানো একজন মহিলা দাঁড়িয়ে। প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর চুল, খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, সমস্ত দেশ মহাদেশ জুড়ে। তাঁর গ্রীবার ভঙ্গিতে রয়েছে তীক্ষ্ণ ধরনের তেজ। তিনি কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়েননি, তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন সোজা, তিনি মোটেই-বেশি-বয়েস-নয় এমন যুবতী হলেও তাঁর সঙ্গে রজনীগন্ধার দণ্ডের তুলনা দিলে ভুল হবে। তাঁকে বলা যায়, কোন বিদ্যুৎ চমকের মতন—কিংবা এ তুলনাটাও বুঝি ভুল হল। ভুল হোক আর যাই হোক, মনে তো হল ঐ রকম।

মহিলাটিকে ঘিরে বেশ ছোটোখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। তিনি আবার

ঈষৎ উঁচু গলায় বললেন, ইংরেজিতে, না, আমি আপনাদের কোন অনুগ্রহ চাই না। আমি নিজেই নিজের দায়িত্ব নিতে পারব। কিন্তু আপনারা আমাকে সব ঘটনা জানাতে চাইছেন না কেন?

পর্যটক দপ্তরের একজন কর্মী বললেন, মাদাম, যা জানাবার তা তো আমরা আপনাকে জানিয়েছি?

মহিলা বললেন, না, জানাননি! আপনারা দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করছেন!

এই সময় আমি সুট করে সেখান থেকে সরে পড়লাম। প্রবাসে আমি বাঙালি সংসর্গ এড়িয়ে চলি পারতপক্ষে। এবং ইংরেজিতে ঝগড়া-করা-সুরে-কথা-বলা নারীদের থেকেও আমি দূরে থাকতে চাই। এখানকার মানুষজন অত্যন্ত ভদ্র, তাদের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলার তো কোন দরকার পড়ে না।

চত্বর পেরিয়ে আমি চলে এলাম বুক স্টোরের দিকে। যে সদা-তরুণটি ঐ দোকানে বসে, তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আখবর আয়া?

ছেলেটি হাতঘড়ি দেখে বলল, আভি আ জায়গা। অন্দর মে আ কে বৈঠিয়ে।

পৌনে একটার আগে যে বিমান-ডাকে কাগজ আসে না, তা আমিও জানি। তবু একটু আগে আসি বই দেখার লোভে। ছেলেটি আমাকে ভেতরে বসিয়ে সব বইটই নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেয়। ওকে একটা সিগারেট দিয়ে আমি চেয়ার টেনে বসলাম।

চারপাশে ঝকঝকে সব নতুন বই, এই দৃশ্যটা চমৎকার লাগে। নতুন বইয়ের সুগন্ধও নাকে এসে ঝাপটা দেয়। সব ক'টি বই-ই ইংরেজি এবং বিদেশে ছাপা। পৃথিবীর আর এমন কোন সভ্যদেশের কথা কল্পনাই করা যায় না, যেখানকার কোন দোকানে সব বিদেশী বই থাকে, দেশের বই একটিও থাকে না।

সৌম্যদর্শন ছেলেটির নাম শমীম। তার ফর্সা রঙের সঙ্গে গায়ের গাঢ় হলদে জামাটি খুব সুন্দর মানিয়েছে। সে টেবিল থেকে আট-দশখানা বই তুলে নিয়ে বলল, স্যার, এগুলো দেখুন, নতুন এসেছে।

আমি এ পর্যন্ত ওর দোকান থেকে একটাও বই কিনিনি। তবু ও আমায় খাতির করে। নেড়ে চেড়ে দেখে দুটি বই বেশ পছন্দ হল। আমি ওর চোখের দিকে তাকালাম।

ও হেসে বলল, নিয়ে যান না!

আমি বললাম, কাল ফেরৎ দেব?

শমীম জানে, আমি ওর নতুন বই ময়লা করে ফেলব না। ওর দোকান থেকেই খবরের কাগজ কিনি, সেই কাগজে বইগুলো সাবধানে মুড়ে রাখি।

এই সময় একটু-আগে-রাস্তায় দেখা সেই বিদেশী মেয়ে দুটি এসে কাউণ্টারে দাঁড়াল। পিকচার পোস্টকার্ড চায়। শমীম ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল। না, আমার ধারণা ভুল, মেয়ে দুটি জার্মান নয়, কোন ল্যাটিন জাতি, কথার মধ্যে একটা ত ত ভাব আছে।

এবার ওদের পাশে এসে দাঁড়াল দুটি মোটাসোটা লম্বা লোক। চকচকে টেরিলিনের জামা, সেই রকমই প্যাণ্ট। মাথার চুলে চটচটে তেলতেল ভাব। একজনের হাতঘড়িতে সোনা রঙের ব্যাণ্ড। এই রকম ঘড়ির ব্যাণ্ডওয়ালা লোকেরা সব সময় সন্দেহজনক হয়। এই রকম কোন লোকের সঙ্গে আমার কোনদিন বন্ধুত্ব হবে না। বিদেশিনী দুটিকে প্রায় কনুই দিয়ে সরিয়ে ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাউণ্টারের ওপর।

ওরা কী কিনতে চাইবে, আমি জানি। ট্যুরিস্ট গাইড ম্যাপ। এই ধরনের লোক কোন একটা জায়গায় আসে নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য, তারপর বুভুক্ষুর মতন দৃশ্য দেখতে ছোটে। আজ এখানে, কাল সেখানে। বার বার জিজ্ঞেস করে, কেয়া কেয়া দেখনে কা হ্যায় ? যেন একটাও বাদ না পড়ে। কোন পাহাড়ের চূড়া, কোন হ্রদ, কোন মন্দির অদেখা রয়ে গেলেই যেন দারুণ ক্ষতি হয়ে যাবে।

দোকানদারের সহকারীর মতন, আমি টেবিল থেকে ট্যুরিস্ট গাইড ম্যাপগুলো গুছিয়ে শমীমের হাতে দিলাম। শমীম আবার ঝকঝকে দাতে হাসলো। ও কবিতা লেখে। ওর খুব ইচ্ছে ওর দু' একটা কবিতা হিন্দী সিনেমায় গান হয়। আমি আজ পর্যন্ত ধর্মেন্দর কিংবা হেমা মালিনীর কোন ফিল্ম দেখিনি শুনে ও একদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এখানে ধর্মেন্দরের একটা ডাকাতির ছবি চার সপ্তাহ ধরে চলছে।

কাউণ্টার আবার ফাঁকা হয়ে গেলে শমীম জিজ্ঞেস করল, আপনি আর কোথাও বেড়াতে গেলেন না ?

সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, যাব।

—আর কতদিন থাকবেন ?

—ঠিক করিনি কিছু।

—আমার দেশ ভালো করে দেখতে গেলে আপনাকে অন্তত দু' মাস থাকতে হবে !

শমীমের দেশ যে আমারও দেশ তা সব সময় মনে থাকে না। না-থাকার অনেক কারণ আছে।

এর মধ্যে খবরের কাগজ এসে পড়ল। বাণ্ডিল খুলে শমীম প্রথম কাগজটা দিল আমাকে। টাটকা খবরের কাগজেরও একটা আলাদা গন্ধ আছে। পয়সা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এবার দেখি টুরিস্ট সেন্টারের সিঁড়িতে সেই মহিলাকে ঘিরে বেশ বড় একটা ভিড়। সেই মিসেস চ্যাটার্জি। এবং তিনি কাঁদছেন।

মহিলাটির পাশে এখন একটি চার পাঁচ বছরের বাচ্চা মেয়ে। মেয়েটি টলটলে চোখ মেলে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। মহিলাটি দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়েছেন, তবু তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে চোখের জল, তাঁর ফোঁপানির শব্দও শোনা যায়।

সব কান্নার পেছনেই একটা করে গল্প থাকে। বিশেষত কোন শিক্ষিতা সুন্দরী মহিলার এরকম প্রকাশ্য দিবালোকে কান্নার দৃশ্য খুবই বিরল, সুতরাং গল্পটি বেশ রোমাঞ্চকর হওয়ারই সম্ভাবনা। সেই গল্পটি জানার জন্য আমার কৌতূহল কিছুতেই দমন করতে পারলাম না। ভিড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি যে ভদ্রমহিলার পাশে দাড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে, আর কেউ নয়, সেই মির্জা আলী। সেই সুদর্শন যুবাকে দেখে তখন মনে হয় কোন ইটালিয়ান ছবির নায়কের মতন। দেখে কে বুঝবে যে, সে একটি হাউসবোটের সরল বোকাসোকা কর্মচারী মাত্র!

দেখতে দেখতে ভিড় আরো বড় হল। পর্যটন দপ্তরের কয়েকজন পদস্থ অফিসার ছুটে এলেন সেখানে। জলে পড়া মানুষের মতন অসহায় গলায় তাঁরা প্লিজ ম্যাডাম, প্লিজ কাম ইনসাইড করতে লাগলেন।

ভদ্রমহিলা মুখ থেকে হাতটা সরালেন। আশ্চর্য, তাঁর মুখে দুঃখের চিহ্ন নেই। বরং অভিমান বা রাগের ছাপ। কোন কারণে তিনি অপমানিত হয়েছেন মনে হয়। তেজস্বিনী নারীরা দুঃখের চেয়ে রাগ বা অপমানেই হঠাৎ কেঁদে ফেলে।

আস্তে আস্তে ভিড়টা ঢুকে গেল হল ঘরের মধ্যে। সেখান থেকে আলাদা একটা কামরায়। কয়েকজন অফিসার ঘরের বাইরে ভিড়টাকে নিরস্ত করলেন। আমি লক্ষ করলাম, মির্জা আলী কিন্তু ঠিক ভদ্রমহিলার পাশে পাশেই রয়েছে।

আমার একবার মনে হল, আমার বোধহয় জোর করে ভিড় ঠেলে ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে বাংলায় কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। উনি যদি কোন বিপদে পড়ে থাকেন, তাহলে হয়তো বাঙালি দেখে...। কিন্তু আমি ভিড়ের মধ্যে আরো কয়েকজন বাঙালি দেখেছিলাম। বাঙালি এমন কিছু দুর্লভ প্রাণী নয়, পৃথিবীর সব জায়গাতেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ মহিলার ত্রাতার ভূমিকা আমাকেই যে নিতে হবে, তার কোন মানে নেই।

বেরিয়ে এলাম বাইরে। গল্পটা জানা হল না। কিছুক্ষণ আগেই ভদ্রমহিলা বেশ দর্পের সঙ্গে কথা বলছিলেন ইংরেজিতে, তারপরেই হঠাৎ এমন বাঙালি কান্না —ঠিক যেন মেলানো যায় না। সঙ্গে শুধু ঐটুকু বাচ্চা মেয়ে, আর কোন পুরুষ

মানুষ কই? কী হয়েছে ওঁর, টাকা হারিয়ে গেছে? সেটা খুব একটা বড় সমস্যা হবে না। শুনেছি এখানকার পর্যটন দপ্তর এতই ভদ্র যে বিশ্বাস করে টাকা ধারও দেয়।

আর বেশি চিন্তা করার সময়ও পেলাম না। আবার মেঘ নিচু হয়ে এসেছে। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। কাছেই দু' তিনটে ট্যাক্সি খালি আছে। কিন্তু শুধু একটা খবরের কাগজ কিনতে এসে ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া উচিত হয়। দ্রুত হাঁটলাম বাস রাস্তার দিকে।

এখানকার বাসগুলো বেশ মজার। বাসে কোনো টিকিট নেই, কখন ছাড়বে, কোথায় থামবে তারও ঠিক নেই। ভর্তি হলে ছাড়ে, আবার পথের মাঝখানে যে-কোন জায়গায় অনুরোধ করলে থেমে পড়ে। কলকাতায় এরকম ব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু এখানে এই বে-নিয়মই বেশ তো চলছে, কোন অসুবিধে নেই।

খবরের কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করে রাখলাম। বাসে কোনো সহযাত্রী ওটা দেখলেই হাত বাড়াবে। নতুন খবরের কাগজ আমার আগেই অন্য কেউ পড়বে—এটা আমার একদম পছন্দ নয়।

সৌভাগ্যবশত বড় রাস্তায় এসে একটু দাঁড়াতেই হজরতবালের বাস পাওয়া গেল। এবং একটা বসার জায়গা। বাসের ভেতরটা বেশ আরামদায়ক গরম।

২

সবাই বলেছিল, নাগিন লেক বেশ নিরিবিলি এবং শান্ত জায়গা। যারা চুপচাপ সময় কাটাতে চায়, তাদের পক্ষে ঐ জায়গাটিই আদর্শ। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়।

প্রথম রাত্রে এখানে এসে পৌঁছেই পর্যটন দপ্তরের এক সহকারীকে বলেছিলাম, নাগিন লেকে একটা ভালো জায়গা ঠিক করে দিন তো!

সহকারীটি তৎক্ষণাৎ পাশের একজন লোকের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, এই তো, এর সঙ্গে যান না!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বাসী তো?

তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, আমাদের এখানে এদের সকলের নাম রেজিস্ট্রি করা আছে। কোন অভিযোগ থাকলে জানাবেন, তাহলে এদের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে!

তবু আমি সাবধানতার জন্য সেখানেই টাকা পয়সার ব্যাপারটা ঠিক করে

নিলাম। কোনক্রমেই যেন পরে বেশি টাকা চেয়ে না বসে!

হাউসবোটের প্রতিনিধিটির নাম হাবীব মুহম্মদ। মির্জা বা শমীমের মতনই সুবেশ সুদর্শন এবং বিনীত মৃদুভাষী। আমার সুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, আপনার আর কোন মালপত্র নেই!

আর শুধু রয়েছে একটা ঝোলা। সেটা আমার কাঁধে। হাবীবকে নিয়ে আমি পর্যটন দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। রাত তখন সাড়ে নটা। এর মধ্যেই রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। হাবীব জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, ট্যাক্সি নেবেন তো?

নতুন লোক দেখলেই যে ট্যাক্সিওয়ালারা ঠকায়, এ আমার জানা আছে।

—এখান থেকে কতটা দূর?

—আট ন' মাইল হবে!

এতদূরের রাস্তা হেঁটে যাওয়া যায় না। সারাদিন বাসে বসে থেকে শরীরটা বেশ ক্লান্ত। যদিও ট্যাক্সি চড়ার বাবুগিরি আমার পোষায় না, তবু প্রথম রাত্তিরে খানিকটা বিলাসিতা করায় দোষ নেই। দু' তিনটি ট্যাক্সি দরাদরি করে এগারো টাকায় রফা হল একজনের সঙ্গে।

ট্যাক্সি এসে থামল ঘুটঘুটে অন্ধকার এক মাঠের মধ্যে। একটু চোখ সইয়ে নেবার পর দেখতে পেলাম, দূরে জলের ওপরে কয়েকটা আলোর বিন্দু। খানিকটা হেঁটে আসার পর হাবীব বললে, দাঁড়ান, শিকারা আনছি।

দূরে কোথাও রেকর্ডে জ্যাজ সঙ্গীত বাজছে। আকাশে কালিগোলা মেঘের সামান্য নড়াচড়া পর্যন্ত নেই। এখানে এই অপরিচিত জায়গায় আমি একা দাঁড়িয়ে। ঠিক যেন মনে হয় অন্ধকারের মধ্যে আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি! হাবীব যদি আর না আসে! না, সে এল একটু বাদেই। ছোট নৌকোয় চেপে একটুক্ষণের মধ্যেই হাউসবোটে পৌঁছোলাম। হাউসবোটের নাম 'সান ডাউনার', একটি বানান ভুল সমেত।

ভেতরে আর কোন মানুষজন নেই। শেষের দিকের ঘরটি আমাকে দেওয়া হল, মেঝেতে কার্পেট পাতা, পরিচ্ছন্ন বিছানা, পাশেই বাথরুম, বাথরুমের কল খুললেই জল পড়ে। বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

জামা প্যান্ট না বদলেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। সারাদিন বাসের ঝাঁকুনিতে হাড়মজ্জায় পর্যন্ত ব্যথা হয়ে গেছে। প্রায় দিন দশেক ধরে নানা জায়গায় টো টো করছি, এমন নরম বিছানায় অনেকদিন শুইনি।

হাবীব জিজ্ঞেস করলো, সাব, খানা বানাব?

আমি বললাম, না, আগে এক কাপ চা নিয়ে এসো!

চা এসে পৌঁছোবার আগেই অন্য লোকের গলার আওয়াজ শুনলুম।

হাউসবোটের পাশে শিকারা এসে লাগল, কাঠের পাটাতনে মচমচ শব্দ হল। মেমসাহেবী গলায় কে যেন বলল, পেছনের ঘরে আলো জ্বলছে...কেউ এসেছে...হয় আমরা থাকব...অথবা সে চলে যাবে...কথাটা বুঝেছ, হয় আমরা থাকব, অথবা সে...কাল সকালের মধ্যেই...

কে কাকে এসব কথা বলছে, আমি খেয়াল করিনি। আমি স্থির নয়নে ওপরের দিকে চেয়ে আলস্য ভাঙছিলুম, কথাগুলো কানে আসছিল এই মাত্র। টের পেলুম, পাশের ঘরে কারা এসে ঢুকল।

নারীকণ্ঠ শুনলে পুরুষ মাত্রেরই একটু চাঞ্চল্য জাগে। মুখটা কিংবা চেহারাটা দেখার জন্য ব্যাকুলতা শুরু হয়ে যায়। গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা গেছে, বয়েস বেশি নয়, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে। মেমসাহেব সঙ্গে অন্য একজন আছে। কাকে অমন বকাবকি করছিল? যাক গে, এক হাউসবোটে আছি যখন নিশ্চয়ই আলাপ হবে কাল সকালে।

পাশের ঘরে জিনিসপত্র ফেলার ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। এত নির্জন রাত যে যে-কোন শব্দই প্রবল মনে হয়। সাহেব-মেমরা তো সাধারণত বেশি শব্দ পছন্দ করে না। আজকাল সব কিছুই বদলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন মেয়েটি ছেলেটিকে বকছে।

একটু পরেই আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বলল, ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

আর একজন বলল, না, না, ছেড়ে দাও!

—কেন ছাড়ব! আমাকে বলতে দাও।

—এখন থাক!

—নো! ইউ স্টে বাহাইণ্ড, ইফ ইউ লাইক!

তারপরই মেম গলায় প্রশ্ন: মে উই কাম ইন?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। জামার বোতামগুলো খোলা ছিল, লাগিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। সাহেব মেম বলে কথা, যথোচিত সম্ভ্রম দেখাতে হবে।

পর্দা সরিয়ে বললাম, ইয়েস, কাম অন ইন!

ছেলেটি ও মেয়েটির বয়েস চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। ছেলেটি পরে আছে খাকি হাফ প্যান্ট ও উলের গেঞ্জি। মেয়েটির গায়ে একটি পাতলা ফ্রক, তার নীচে অন্তর্বাস কিছুই নেই। এখানে শীত এখনো তীব্র না হলেও আমাদের একটা সোয়েটার লাগে। ওদের সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের দু' জনের বিবর্ণ মুখ ও জ্যোতিহীন চোখ দেখলেই বোঝা যায়, ওরা বটিকাসেবী। এখনো কোন বটিকার নেশায় রয়েছে।

দরজার বাইরে হাবীব এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনা ভূমিকায় পুরুষটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোন বাচ্চা ছেলেকে আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেছ?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, না তো!

এবার মেয়েটি বলল, তুমি কোন বাচ্চা ছেলেকে আমার ঘর থেকে চুপিচুপি বেরুতে কি দেখেছ?

—না! আমি তো এই একটু আগে এসেছি!

পেছন থেকে হাবীব ব্যস্তভাবে তার ভাঙা ইংরেজি আরো ভেঙে ফেলে বলল, স্যার, না, এখানে আর কেউ আসে না, কেউ আসতে পারে না, তা ছাড়া আমাদের ফ্যামিলিতে কোন বাচ্চা ছেলেই নেই!

মেয়েটি তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমার দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি সেরকম কারুকে দেখনি? অদ্ভুত! তা হলে আমাদের ঘর থেকে যে পঞ্চাশ ডলার চুরি গেছে, তা কী করে ব্যাখ্যা করা যায়? নিশ্চয়ই ঘরে কেউ ঢুকেছিল। তুমি কারুকে দেখনি?

আমি বললাম, আমি তো এই একটু আগে এসেছি, ঘর থেকে একবারও বেরোইনি, আমি দেখব কী করে? তোমাদের ঘর কি বন্ধ ছিল না?

—আমরা কখনো ঘর বন্ধ রাখি না। আমাদের পঞ্চাশ ডলার চুরি গেছে, আমরা কালই পুলিশে খবর দেব! ছাড়ব না।

মেয়েটির কণ্ঠস্বর অসম্ভব তীক্ষ্ণ। সে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকায়নি। কথা বলছে দেয়ালের দিকে চেয়ে। তার মুখ ভর্তি অহংকার। এক সময় তার মুখখানি বেশ সুশ্রী ছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু ঐ অহংকার এবং চোখের জ্যোতিহীনতা যেন তার রূপ কেড়ে নিয়েছে।

আমি তাদের ব্যবহারের মর্ম কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কেন তারা এত রেগে আছে? পঞ্চাশ ডলার যদি চুরি গিয়েও থাকে, তার সঙ্গে কোন বাচ্চা ছেলের সম্পর্ক কি?

হাবীব আবার কিছু বলার চেষ্টা করতেই মেয়েটি তাকে ধমক দিয়ে বলল, ছাড়ব না, বুঝলে? ঠিক পুলিশে খবর দেব।

তারপর মেয়েটি পেছন ফিরে গটগট করে বেরিয়ে গেল। ছেলেটিও অনুসরণ করল তাকে।

হাবীব আমার ঘরে ঢুকে চায়ের কাপ রাখল ড্রেসিং টেবলে। তারপর অপরাধীর মতন মুখ করে চুপ করে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার হাবীব? এখানে টাকা চুরি হয়?

হাবীব কাতরভাবে বলল, না, সাব। আমি আল্লার নামে শপথ করছি, এখান থেকে কেউ কোনদিন এক পয়সা নেয় না। সাব, আমি অনেক সাহেব মেম দেখেছি, কিন্তু এদের মতন পাগল আর দেখিনি। এরা একদম পাগল। অন্য কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না।

—এরা কী জাত ?

—ক্যানাডিয়ান। এরা দশ দিন ধরে এখানে আছে!

আমি চুপ করে রইলাম। হাবীব নিঃশব্দে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমার খেয়াল হল, আমি চায়ের কাপে একবারও চুমুক দিইনি। ঘরের মাঝখানে সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তখন থেকে। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, রাগে আমার সারা গা জ্বলছে। ঐ সাহেব মেম দুটো এসে হঠাৎ আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল কেন ? আমি কি ওদের দেশে গিয়ে কারুর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে সাহস করতাম ! ওরা ভেবেছে কি ? সাহেব মেম বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে ?

সুটকেস খুলে আমি ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বার করলাম। তার থেকে দুটো বড় বড় চুমুক দেবার পর সারাদিনের ক্লান্তি জড়তা কেটে গিয়ে শরীরে একটা চাঙ্গা ভাব এল। আমার চোখে লালচে ভাব দেখা দিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো, আঙুলগুলোর ডগায় শিরশিরানি এল। আমি ঠিক করলাম, ওদের ক্ষমা চাইতে হবে।

ওদের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, ভেতরে আসতে পারি ?

ছেলেটি বলল, ইয়েস ?

পর্দা সরিয়ে দেখলাম, মেয়েটি ছেলেটির কোলের ওপর বসে আছে। আমাকে দেখেও এক চুল নড়ল না। আমিও দ্বিধা করলাম না।

ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমরা আমার ঘরে গিয়ে হঠাৎ এরকম ব্যবহার করলে কেন ?

ছেলেটি বলল, আমাদের টাকা চুরি গেছে, তাই জানতে চাইলাম, তুমি কিছু জান কিনা !

—আমি কি করে জানব, আমি একটু আগে এসেছি।

—তাহলে তো ব্যাপারটা সেখানেই ফুরিয়ে গেল।

—না, ফুরিয়ে গেল না। হাবীব বলছে, এদের পরিবারে কোন বাচ্চা ছেলেই নেই। তাহলে এখানে কোন বাচ্চা ছেলে আসবে কী করে ? তোমরাই বা আমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলে কেন ?

মেয়েটি বলল, আমাদের টাকা চুরি গেছে, সেটা তো সত্যি—

আমি বললাম, তাই তোমরা জানতে চেয়েছিলে টাকাটা আমি নিয়েছি কিনা?

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, সে কথা তোমাকে বলব কেন? তুমি কোন খবর জান কিনা—

—আমার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় নেই। আমি যত দূর জানি, অপরিচিত কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আগে আত্মপরিচয় দেওয়াই তোমাদের নিয়ম। কিন্তু তোমরা যেভাবে আমার ঘরে ঢুকে কথা শুরু করলে, তাতে তোমাদের কোন সভ্য দেশের মানুষ মনে হয় না।

ছেলেটি কাঁধ ঝাঁকাল শুধু।

আমি আবার বললাম, শুনেছি তোমরা ক্যানেডিয়ান। সৌভাগ্যবশত তোমাদের দেশের আরো কয়েকজন নারী-পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে এবং তারা অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র। তাদের না চিনলে তোমাদের দেশটা সম্পর্কেই আমার একটা খারাপ ধারণা হয়ে থাকত।

ছেলেটি এবার মৃদু গলায় বলল, আমরা দুঃখিত।

—নিশ্চয়ই তোমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত!

—আমরা সত্যিই দুঃখিত। তোমার সঙ্গে আমরা ইচ্ছে করে খারাপ ব্যবহার করতে চাইনি—

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে বেশ একটা তৃপ্তির ভাব। খুব গায়ের ঝাল ঝাড়া গেছে। ব্যাটাদের দিয়ে ক্ষমা চাইয়ে ছেড়েছি তো!

নিজের ঘরে এসে ব্র্যাণ্ডির বোতলে আর একটা চুমুক দিতেই পাশের ঘরে মেয়েটির সরু গলায় হি-হি-হি-হি হাসি শুনতে পেলাম। আবার চড়াৎ করে রাগ চড়ে গেল। এ তো অপমানের হাসি নয়! ওরা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করছে। আমারই দেশে বসে দুটি বিদেশী খারাপ ব্যবহার করবে আমার সঙ্গে!

মনে হলো, শুধু মুখের কথাই যথেষ্ট নয়। ওদের মার দেওয়া দরকার। দুটো মোদকখোর ছ্যামড়া-ছেমড়িকে মারবার জন্য বেশি গায়ের জোর লাগে না। ওদের মাথা ঠুকে দিয়ে বলল, যা ভাগ, পালা এদেশ থেকে।

সত্যিই ওদের ঘরে ফিরে যাচ্ছিলাম, এই সময় হাবীব এসে ঢুকল। মেঝের ওপর বসে পড়ে বলল, সাব, দুটো কথা বলব, রাগ করবেন না?

আমি বললাম, আগে বলো, সত্যিই ওদের টাকা চুরি গেছে?

—না। সাব, একদম মিথ্যে কথা। আল্লার কিরে দিয়ে বলছি।

—তাহলে ওরা এরকম কথা বলছে কেন?

—বললাম না সাব, ওরা একদম পাগল। এই তো নাগিন লেকে কত বোট

আছে, অনেক সাহেব আছে—কেউ এদের মতন নয়। এরা কারুর সঙ্গে কথা বলে না, সারাদিন বোটের মধ্যে নাঙ্গা হয়ে থাকে।

—কী হয়ে থাকে?

—নাঙ্গা, সাব। একদম নেকেড। আর দাওয়াই খায়, কেতাব পড়ে। আজ আপনি এসেছেন তো, তাই রেগে গেছে। ওরা এখন বলছে, পুরা বোটটা ভাড়া নেবে।

—পুরা বোট মানে? আমার ঘরটাও?

—তাই তো বলছে এখন।

—তার মানে? আমি এ ঘর ভাড়া নিয়েছি, ওরা কী করে নেবে? তুমি আগে আমাকে সে কথা বলনি কেন?

—সাব, ওরা তো আগে পুরা বোট নেয়নি। এতদিন এ কামরা খালি ছিল।

—ওরাও টাকা দিচ্ছে, আমিও টাকা দিচ্ছি। আমি আমার কামরা ছাড়ব কেন? ওদের পছন্দ না হয়, ওদের চলে যেতে বলো।

—সাব, আপনি যদি বলেন, আমি এখুনি ওদের লাথ মেরে ভাগিয়ে দেব। আমরা কখনো নিমকহারামী করি না। আপনি মেহমান, আপনি যতদিন খুশি থাকুন। ওদের ভাগিয়ে দেব, সাব? তবে ওরা ডবল টাকা দেয়!

—ডবল টাকা দেয়?

—হাঁ সাব! ঐ শ্লিপিং বেগটা দেখছেন, ওটাও ওরা দিয়েছে।

একটা চকচকে শ্লিপিং ব্যাগ বিছানার ওপর পাতা ছিল। দেখলেই বোঝা যায় জিনিসটা বিদেশী। আমি সেটার ওপরই বসে ছিলাম, ঘেন্নায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

হাবীব বলল, সাহেবলোগ বেশি টাকা দেয়, বহুৎ চীজ এইসাই আমাদের দিয়ে যায়। একবার যদি এই সাহেবদের আমার বোট থেকে তাড়িয়ে দিই, তাহলে আর কখনো কোন সাহেবলোগ আমার বোটে আসবে না। তবু আপনি বলুন, আমি এই রাত্রেই ওদের তাড়িয়ে দিতে পারি। আপনি টুরিস্ট ডিপার্ট-এ গিয়ে কমপ্লেন করলে আমার লাইসেন্স চলে যাবে। দু বছর কোন কাম পাব না। এখানকার গরমিন্ট খুব কড়া। সাব, তাহলে আপনিই থাকুন, আমি ওদের তাড়িয়ে দিই?

আমি চুপ করে রইলাম। তক্ষুনি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।

হাবীব বলল, আর এক কাম করা যায়। কাছেই আমার কাকার বোট। সে বোট এর চেয়েও বঢ়িয়া। সেখানে থাকতে পারেন। এর থেকে অনেক বেশি আরাম পাবেন। টাকা এখানে যা দিতেন, ওখানেও তা-ই দেবেন—আমি নিজে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব—

অর্থাৎ অপমান সহ্য করে চলে যেতে হবে আমাকেই। কেন? এটা আমার দেশ, আমার ন্যায্য অধিকার নেই? এখনো আমি গোঁয়ারের মতন বলতে পারি, না, আমি যাব না, ওদের তাড়াও। তার ফলে কী হবে? আমি ওদের মতন বেশি টাকা দিতে পারব না। ওদের মতন ফেরার সময় দামি দামি জিনিস উপহার দিয়ে যেতে পারব না। আমি খুব জোর করলে, হাবীব ওদের বিদায় করে দিতেও পারে। তারপর সব সময় আমাকে নীরব অভিশাপ দেবে। ওর অনেক আয় কমে গেলেও কিছুতেই আমাকে আন্তরিকভাবে খাতির করবে না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ঠিক আছে, আমিই চলে যাব!

হাবীব অত্যন্ত বিনীত হয়ে বলল, সাব, আপনি আমার ওপর রাগ করলেন না তো? আপনি এখনো বলুন, যদি আপনি থাকতে চান, আপনিই থাকবেন, ওরা চলে যাবে। বাঙ্গালীরা খুব শরীফ আদমি হয়—আগে অনেক বাঙ্গালী আসত, আমার বাপ-দাদার কাছে শুনেছি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, চলো, আমি এক্ষুনি যাব, তোমার সেই কাকার বোটে। অন্য কোথায়ও তো আর এত রাত্রে যাওয়া যাবে না—

ঐ ক্যানেডিয়ান যুগলের কাছে আমি হেরে গেলাম। ওদের শাদা চামড়া, তাই ওরা জিতবেই। না, শুধু শাদা চামড়া কেন, টাকাটাই আসল, টাকাই জেতে। একজন কোন মাড়োয়ারী যদি এরকম অভদ্রভাবে পুরো বোটটা ভাড়া নিতে চাইত, তখন আমি কী করতাম? বেশি অর্থ থাকলে কি মানুষ বেশি অভদ্র হয়? সেরকম তো কথা নয়। ঐশ্বর্য থেকে আসে আভিজাত্য। সূক্ষ্ম ভদ্রতা, সভ্যতা, শিল্পরুচি—এসব তো অভিজাতদের কাছ থেকেই এসেছে। তবে দু এক পুরুষে হয় না। এইসব ক্যানেডিয়ান আমেরিকান বা ব্যবসায়ী মাড়োয়ারীরা দু এক পুরুষের বড়লোক —টাকার আঁচটাই এদের গায়ে লেগে আছে, ঐশ্বর্যের দীপ্তি এখনো লাগেনি।

যাওয়ার আগে ছোকরাটিকে একটা অন্তত ঘুঁষি মেরে যাওয়া উচিত নয় আমার? ছেলেটির চেয়ে মেয়েটির ওপরেই আমার রাগ বেশি, কারণ তার কথার মধ্যেই ছিল বেশি হুল—কিন্তু মেয়েদের গায়ে তো হাত তোলা যাবে না! তাছাড়া ভারতীয়দের বিখ্যাত ভদ্রতাবোধ, অতিথির প্রতি মর্যাদা, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ক্যানাডায় আমার এক আত্মীয়—এইসব চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল। আমি ওদের ক্ষমা করে দিলাম। অক্ষমের ক্ষমা।

শিকারায় চেপে এলাম হাবীবের কাকার বোটে। এখানেও বসবার ঘরে জ্যাজ বাজনা চলছে। আমি এসে ঢুকলাম খাবার ঘর দিয়ে। বোটের মালিক এক বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন করে বলল, আমি সব শুনেছি, সাব! ছি ছি, কী অন্যায় কথা! আমি বহুৎ সাহেব মেম দেখেছি, কিন্তু এরকম বেহুদা আদমী আর কখনো

দেখিনি। আপনি চলে এসে ভালোই করেছেন সাব, ওরা পাগল, আপনাকে জ্বালিয়ে মারত !

আমি মনে মনে বললাম, পাগল হোক আর বেহুদাই হোক, তাদের যদি টাকা থাকে, তা হলে খাতির করতেই হয়। তাদের তাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৃদ্ধটি আবার বলল, সাব, আপনি তো বাঙ্গালী, আগে এখানে বহুৎ বাঙ্গালী আসত—বাঙ্গালীরা খুব আচ্ছা আদমী হয়, এত ভালো ব্যবহার—

বুঝলাম, বাঙ্গালীর প্রশংসা করে আমার মন ভেজাবার চেষ্টা হচ্ছে। নির্লিপ্ত গলায় বললাম, আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও, আর আমার খাবার আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও !

আগের বোটের তুলনায় এখানে আমার ঘরটা ছোটো। খাটের একটা পায়া নড়বড়ে। কম্বলের এক পাশে একটা গোল পোড়া দাগ, ড্রেসিং টেবলের আয়নার কাচটা ফাটা। যাক আজ রাতটা তো এখানেই কাটুক, কাল সকালে উঠে কী করা যায় দেখা যাবে !

একটু বাদে ডিমের ঝোল আর ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল বিকট শব্দে। মনে হলো যেন কাঠের বারান্দা দিয়ে দুটি দৈত্য দৌড়ে গেল। কাঠের ওপর দিয়ে কেউ হাঁটলেই বেশ মচমচ শব্দ হয়। কিন্তু এত জোর শব্দ ?

উঠে এসে দরজা খুলে উঁকি দিলাম। খাবার ঘরের সামনে একটি দৈত্যাকার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এও সাহেব! এত বিরাট শরীর হলেও মুখখানি খুব সরল ও কোমল, বোঝা যায় বয়েস বেশি না, কুড়ি-একুশ হবে।

ছেলেটি আমাকে দেখে নিজের থেকেই বলল, সুপ্রভাত ! তুমিই তো কাল রাত্রে এসেছ ?

আমি বললাম, সুপ্রভাত। হ্যাঁ, আমিই কাল রাত্রির আগন্তুক।

ছেলেটি বলল, তোমার এত দেরি করে ঘুম ভাঙে ? শিগগির বাইরে এসো, দেখো, বাইরেটা কী চমৎকার ! আজ বৃষ্টি নেই, কুয়াশা নেই, পরিষ্কার আকাশ—

ছেলেটির কথার মধ্যে বেশ একটা আপনকরা ভাব আছে। শুনতে ভালো লাগে। যদিও তার ইংরেজি ভাষা ভাঙা ভাঙা। আমি বললাম, আসছি, একটু পরেই আসছি !

গত রাত্রের সেই বৃদ্ধটি বাইরে থেকে আমার জানলায় উঁকি দিয়ে বলল, সাব, আপনাকে চা দিইনি, ক'টার সময় বেড-টি দিতে হবে, কাল তো বলেননি কিছু !

—নিয়ে এসো, এখন নিয়ে এসো !

ঘড়িতে দেখি সাড়ে সাতটা বাজে। এমন কিছু দেরি করে তো উঠিনি। এর চেয়ে তাড়াতাড়ি কোন ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে চা খেয়ে মুখ-টুখ ধুয়ে বাইরে এলাম। গত রাত্রের তিক্ত অভিজ্ঞতাটি অনেকখানি ফিকে হয়ে গেছে। তবু মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, আজই এ পাড়া থেকে হাওয়া হয়ে যাব!

যুবক দৈত্যটি তখনো খাবার ঘরে দাঁড়িয়ে। একটা টিনের কৌটো কেটে কী সব যেন বার করছে। আমায় দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আমার নাম অমুক, আমি জার্মানির মিউনিখ থেকে আসছি।

আমি তার হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, আমার নাম অমুক, আমি কলকাতা শহর থেকে আসছি!

ছেলেটির নামটা বেশ দুর্বোধ্য ধরনের, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ছেলেটির কানে আমার নামটাও নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য লাগল। কিন্তু কলকাতার কথা শুনে সে একটু বিস্মিত ভাবে তাকিয়ে বলল, কলকাতা! সে তো অনেক দূর—

আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে মিউনিখের থেকে দূরে নয়।

ছেলেটি বলল, আমি আর আমার এক বন্ধু এসেছি। তুমি একলা এসেছ?

—হ্যাঁ।

—ঐ যে আমার বন্ধু। পরে নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আলাপ হবে।

ওর বন্ধু বসবার ঘরের বারান্দায় উবু হয়ে বসে কয়েকটি স্থানীয় ছেলে-মেয়ের মাছ ধরা দেখছে। তার এমনিই সাধারণ ছোটোখাটো চেহারা। তা হলে দ্বিতীয় দৈত্যটি কোথায়?

তাকে দেখেছিলাম বেশ কিছুক্ষণ পরে। তার আগে—আমিও এগিয়ে গেলাম বোটের সামনের দিকের বারান্দায়। উবু হয়ে বসে থাকা ছেলেটি তেমন আলাপী নয়, আমার দিকে চোখ তুলে শুধু একবার বলল, হ্যালো! আমিও প্রত্যুত্তরে তাই জানিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে রেলিং-এ ভর দিলাম।

নাগিন হ্রদের জল ডাল হ্রদের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। যদিও তলায় প্রচুর ঝাঁঝি আছে। মসৃণ কালচে নীল জল, সেদিকে তাকালেই একটা গভীর অথচ শান্ত অনুভূতি হয়। এক পাশে কিছু পদ্ম ফুটে আছে।

কয়েকটি ছোট ছোট নৌকোয় স্থানীয় ছেলেমেয়েরা মাছ ধরছে। বেশ মাছ এখানে। মাঝে মাঝেই বড়শির টানে মাছ উঠে আসছে চটাস চটাস করে। বেশি বড় নয়, তিন চার শো গ্রাম। জার্মান ছেলেটির নিশ্চয়ই নিজেরও মাছ ধরার নেশা, কারণ সে এই দৃশ্য দেখছে খুব আগ্রহের সঙ্গে।

আমি একবার তির্যকভাবে ডান দিকে আমার গত রাত্রে পরিত্যক্ত হাউস বোটটির দিকে তাকালাম। সেটা এখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু ক্যানেডিয়ান দম্পতির (দম্পতি কিনা ঠিক জানি না। আজকাল এক ঘরে সহবাসকারী দুই নারী পুরুষ সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না) কোন চিহ্ন নেই বাইরে। তবু সেই বোটটার দিকে তাকিয়েই আবার আমার রাগে গা পুড়ল। ওদের মুখ দর্শন করতে চাই না আর, দুপুরেই গিয়ে শ্রীনগরে কোন হোটেল ঠিক করে আসতে হবে।

এই হ্রদ ও হাউসবোটগুলি ছাড়িয়ে দূরে আকাশের গায়ে এক সুমহান দৃশ্য নিবদ্ধ হয়ে আছে। দু' দিকে যত দূরে চোখ যায়, সারি সারি পর্বত-শিখর তুষার ঢাকা। সকাল বেলার রোদে সেগুলিতে সোনার আভা লেগেছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমার মনের ছোটোখাটো দুঃখ ও ক্ষোভ দূর হয়ে যায়। এক অদ্ভুত সুন্দর রকমের গাম্ভীর্য এসে মনকে ছেয়ে ফেলে।

এই সেই পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা। এরই একটি শৃঙ্গের পেটের ভেতরের গহ্বর দিয়ে আজকাল শ্রীনগরে আসতে হয়। আসবার সময় খুব কাছ থেকে একে দেখেছি, এখন খানিকটা দূরত্বে এর ব্যাপ্তি ও বিশালত্ব আরো বেশি চোখে পড়ে। খুব সুন্দর কোন ছবি একটু দূর থেকেই দেখতে হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমি অনেক অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছি। কোন দৃশ্যই আর কোনটির তুলনায় শ্রেষ্ঠ মনে হয়নি কখনো। তবু এই রকম বরফ ঢাকা পাহাড়ের মধ্যে যেন একটা চিরায়তের স্পর্শ আছে। এই পৃথিবীতে পাহাড়ই সবচেয়ে প্রাচীন। মানুষেরও জন্মের বহু আগে থেকে এই সব পর্বত মাথায় তুষার মুকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—হয়তো একদিন আবার মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবু এরা থাকবে। সমুদ্রও এমনই প্রাচীন, এমনই চিরন্তন, কিন্তু সমুদ্র দর্শনে সে অনুভূতি জাগে না, অন্তত আমার। পর্বতই আমার অয়স্কান্ত মণি।

হ্রদের জলে ঝপাং করে একটা শব্দ হতে আমার ঘোর ভাঙল। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নৌকো থেকে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা সবাই টুকটুকে ফর্সা, টানা টানা চোখ, মাথা ভর্তি অযত্নের চুল—ঠিক দেবশিশুদের মতন দেখায়।

নিরীহ জার্মান ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছে। এত কাছাকাছি কেউ থাকলে দু' একটা কথা বলা উচিত বলেই আমি বললাম, এই ছেলেমেয়েরা কত অল্প বয়েস থেকে সাঁতার জানে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে, তাই না?

ছেলেটি যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, ইয়েস, আই সুইম, বাট নট হিয়ার, নো সুইম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এখানে কতদিন এসেছ?

—হোয়াট?

আমি আমার প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম। সে বলল, দু' মাসের বেশি।

—কী! এখানে দু' মাসের বেশি আছো?

—হিয়ার? নো। ফ্রম জার্মানি...মোর টু মানথ্‌স।

এবার বুঝলাম, এই ছেলেটি কেন কম-আলাপী। এ ভালো ইংরেজি জানে না। আমি গোপনে বেশ খুশি হয়ে উঠলুম। কোন সাহেবের ইংরেজি জ্ঞান কম দেখলেই আমার এরকম আনন্দ নয়। ভাষার দীনতা থাকলে মানুষ অনেকটা দীন হয়ে যায়। তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় না। এখন এর ওপর আমি অনায়াসে অনেক রকম চাল মারতে পারি। অবশ্য একজন জার্মান ছেলে যদি ইংরেজি কম জানে, সেটা তার পক্ষে দোষের কিছু নয়। তা বলে, আমার মতন একজন বাঙালি ছেলে দু' চারটে ভুল ইংরেজি বললে সেটাও তো দোষের কিছু না হওয়া উচিত। সেটা কেন অন্য লোকরা বোঝে না?

হাউসবোটের একজন পরিচারক আমাদের ব্রেকফাস্ট খাবার জন্য ডাকতে এল। আমি জার্মান ছেলেটিকে বললাম, তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি!

সাহেবসুবোর সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানাপিনা আমার পছন্দ নয়। ঠিকঠাক কাঁটা চামচে ধরার সহবৎ কিংবা ফুরুৎ ফুরুৎ শব্দ না করে চা পানের কৃত্রিম চেষ্টা—এ আমার সব সময়ে ভালো লাগে না। এর চেয়ে একলা একলা খাবার খেতে আমার অনেক বেশি ভালো লাগবে।

আরও কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এলাকাটা সত্যিই খুব নিরিবিলি। শ্রীনগরের দুর্দান্ত টুরিস্ট ভিড়ের কোন চিহ্ন নেই। খানিকটা করে দূরত্ব রেখে পাশাপাশি অনেকগুলি হাউসবোট। কোথাও কোন শব্দ নেই। অনেক হাউসবোটের আবাসিকরাই জেগে উঠে বাইরে এসেছে। সবাই সাহেব মেম। জায়গাটাকে মনে হয় যেন শ্বেতাঙ্গদের একটা আলাদা উপনিবেশ, এর মধ্যে আমি এসে পড়েছি পথভ্রষ্ট হয়ে।

আমার ঠিক বাঁ পাশের বোটটাতেই দুটি তরুণ ও একটি তরুণী ছাদে এসে বসেছে রোদ পোহাতে। তরুণীটি খুবই সুশ্রী। সে পরে আছে একটি অতি ছোট জাঙ্গিয়া ও একটি রুমালের আকারের ব্রা। তার পায়ের নখ পর্যন্ত সবই অতি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। তার ফর্সা কোমল ত্বক, নীল চোখ, সোনালী চুল, হঠাৎ যেন তাকে মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় অন্য কোন গ্রহের প্রাণী। তার উরুতে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে, ঠিক মনে হয় সোনার; একেই বলা উচিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। কাঞ্চনজঙ্ঘা নারী—শুনতে বেশ। জঙ্ঘা মানে হাঁটুর নীচের দিক?

এ ক্ষেত্রে উরুই মানায় ভালো। আজ থেকে জঙ্ঘা মানে উরু হোক, এই আমি ফতোয়া দিলাম।

মেয়েটি বা তার সঙ্গী দু' জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি ঈষৎ লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছি। পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, কোন স্বল্পবাসা তরুণী যদি প্রকাশ্য জায়গায় এসে বসে, তবে তা তো অন্যদের দেখবার জন্যই। এতে লজ্জার কী আছে? আবার সেদিকে চোখ যায়। বস্তুত, চিরাগত পাহাড়ের দৃশ্যের চেয়ে এই সাময়িক রমণী সৌন্দর্যই এখন আমার চোখ বেশি করে টানে। তবু বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারি না। খুব ভেতরে ভেতরে এক ধরনের লজ্জা থেকেই যায়। এতখানি প্রকাশ্য নয়, রমণীর এমন নিরাবরণ রূপ যেন কিছুটা আড়ালে বা গোপনে দেখার মধ্যেই বেশি তৃপ্তি।

তা ছাড়া, একবার আমার মনে হয়, ওর সঙ্গী দু'জন বোধ হয় ভাবছে, আমি জীবনে কখনো মেম দেখিনি। আমি হ্যাংলা বাঙালি, তাই এমন লোভীর মতন তাকাচ্ছি। যা, যা, তোরা কি জানিস রে? আমি ঢের মেম দেখেছি জীবনে। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা মেম যুবতী ছিল আমার বান্ধবী। আমার আর মেম দেখার দরকার নেই!

বারান্দা থেকে চলে এলাম বসবার ঘরে। মনে একটা খটকা রয়ে গেল। একটি যুবতীর সঙ্গে দুটি সাহেব কেন? দু'জনকেই তো মনে হল, ওর সমান বন্ধু। এ কী রকম সম্মিলন? মেয়েটি কি নব দ্রৌপদী?

এ হাউসবোটটি বেশ লম্বা। সামনের দিকে বারান্দা, তারপর বসবার ঘর। বসবার ঘরটি বেশ সুচারুভাবে সাজান। মেঝেতে পুরু গালিচা। দেওয়ালের ঘড়ি থেকে প্রতিটি ক্যালেণ্ডার ও ছবিই বিদেশী। বোঝা যায় সাহেবদের দান। এর পর খাবার ঘর। সেটিও বেশ ঝকঝকে বাসনপত্রে ভর্তি। তার পাশ দিয়ে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। পেছন দিকে পর পর তিনটি ঘর। আমার ঘরটাই প্রথম। সাধারণত হাউসবোটে দুটি শয়নকক্ষ থাকে, এখানে তিনটি। এর মধ্যে আমারটাই সবচেয়ে ওঁচা, কোনো রকমে জোড়াতালি দেওয়া। আর একটি ঘর খালি থাকতেও আমাকে দেখানো হয়নি, বোধ হয় সেটি এর চেয়ে ভালো। নিশ্চয়ই সেটি আর কোন সাহেবের জন্য সংরক্ষিত। আমার কাছ থেকে এরা বেশি টাকা পাবে না, যা গভর্নমেণ্ট রেট তাই, কিন্তু সাহেবদের কথা আলাদা।

জার্মান ছেলে দুটির ব্রেকফাস্ট এখনো শেষ হয়নি। এরা ভারী ব্রেকফাস্ট খায়। খাক না যতক্ষণ খুশি, আমার তাড়া নেই।

বসবার ঘরের একটা র‍্যাকে কিছু বইপত্র রয়েছে। কাছে গিয়ে উল্টে উল্টে দেখলাম। বিচিত্র সমাহার। গোয়েন্দা কাহিনী, পর্নোগ্রাফি থেকে শুরু করে গম্ভীর

ইতিহাস কিংবা পশুবিজ্ঞান, মূল ফরাসী ভাষার কবিতা, জার্মান ভাষার অর্থনীতি। প্রত্যেকটি বইতেই আলাদা লোকের নাম লেখা। বোঝা যায়, আগেকার ভ্রমণকারীরা এই সব বই ফেলে গেছে। একটি বই আবার চীনে ভাষায়। এটি নিশ্চয়ই কোন স্পাইয়ের ছিল। কারণ নিকট ভবিষ্যতে কোন চীনের লোকের তো ভারতে ভ্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল না।

বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম, এর মধ্যে জার্মান ছেলে দুটি খাওয়া শেষ করে উঠে গেল। আমি একটা গোয়েন্দা উপন্যাস বেছে নিয়ে খাওয়ার টেবিলে এসে বসলাম। একটি দশ এগারো বছরের ছোট ছেলে আমার প্লেট সাজিয়ে দিল। ছেলেটির মুখের সঙ্গে চিত্রাভিনেতা টনি কার্টিসের খুব মিল আছে। বড় হলে ঠিক সেই রকম দেখতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

সে লাজুক হেসে বলল, মিরাজ। মিরাজ দিল।

এটা একটা নতুন রকমের নাম শুনলাম। এর আগে দেখেছি সকলের নামই প্রায় এক রকম। জম্মু থেকে ঘুরতে ঘুরতে, নানা জায়গায় থেমে থেমে আমি আসছি, তার মধ্যে শুধু আলী মুহম্মদ নামেই অন্তত দশটা লোক দেখেছি।

—তুমি ইস্কুলে পড়ো, মিরাজ?

সে দু' দিকে মাথা নেড়ে জানাল, না। তারপর একটু থেমে বলল, আগে দু' বছর পড়েছি, এখন পড়ি না।

ছেলেটি কিন্তু বেশ ইংরেজি জানে। খানিকক্ষণ আগে দূর থেকে শুনছিলাম, সে জার্মান ছেলে দুটির সঙ্গে গড়গড় করে ইংরেজি বলে যাচ্ছে। ক্রিয়াপদহীন, কিন্তু উচ্চারণ মার্কিনীদের মতন।

খাবার ঘরের একটা জানলা দিয়ে খুব কাছেই একটা বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ দেখা যায়। মাঝে মাঝে কয়েকটি বেশি-উঁচু-নয় গাছ, তাতে টুকটুকে লাল রঙের ছোট ছোট ফল ফলে আছে অসংখ্য। পরে জেনেছিলাম, ঐগুলোই চেরী ফল, চমৎকার টক-মিষ্টি স্বাদ।

এই হাউসবোটটা ভূমির খুব কাছাকাছি বাঁধা। জলের ওপর একটা চওড়া তক্তা পাতা, তার ওপর দিয়ে ভূমিতে যাওয়া যায়। সামনেই একটি ছোট চালা ঘর, সেখানে এদের রান্নাবান্না হয়।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে আমি বইটাতে মন দিয়েছিলাম, এমন সময় ধুম ধ্রাম শব্দ হলো সেই তক্তার ওপর, তারপরই কিছু একটা প্রচণ্ড শব্দে লাফিয়ে পড়লো হাউসবোটের মধ্যে। সেই ধাক্কায় গোটা বোটটা কেঁপে উঠল। আবার দৈত্য? না, আমি তাকিয়ে দেখলাম, একটা নেকড়ে বাঘ!

আমার হাত থেকে বই আর টোস্ট খসে পড়ল। আমি আঁতকে উঠলাম। সেটা আমার দিকেই চেয়ে আছে। ঠিক নেকড়ে বাঘ নয় অবশ্য, তারই নিকটতম বংশধর, আজকাল অনেকে এদেরও কুকুর নামে ডাকে।

প্রকৃতপক্ষে কুকুরটা নেকড়ের চেয়েও আকারে বড়, হিংস্র দুটি চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে হাড়-হিম-করা গ্রাউ গ্রাউ শব্দে ডাকল, তারপর দুই লাফে এগিয়ে এসে আমার গায়ের ওপর থাবা তুলে দিল।

আমার তখন বাবা-রে মা-রে মরে গেলাম-রে বাঁচা-রে—এই রকম চেঁচিয়ে ওঠার মতন অবস্থা, কিন্তু নিজেকে অতি কষ্টে সামলে চুপ করে রইলাম। শুনেছি, চেঁচালে কুকুররা আরো রেগে যায়। আমি এমনিতেই কুকুর সহ্য করতে পারি না, তার ওপর এই কুকুর নামে দৈত্য!

কুকুরটা আমার গায়ের ওপর থাবা তুলে তখনও সেই রকম ভাবে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছুটে এল বিরাট চেহারার জার্মান ছেলেটি, মিরাজ আর গত রাত্রের বৃদ্ধ। জার্মান ছেলেটি কুকুরটার কলার ধরে নিয়ে গিয়ে ভর্ৎসনার সঙ্গে বলতে লাগল, হুকো! হুকো!

আমার গলা শুকিয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে। ক্রুদ্ধভাবে আমি বৃদ্ধের দিকে তাকালাম। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সব ঠিক হো গিয়া সাব! আর কুছ নেই হোগা।

জার্মান ছেলেটি বলল, দুঃখিত, কুকুরটির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি,—এর নাম হুকো। এ আর তোমাকে কিছু বলবে না।

তারপর সে কুকুরটাকে জার্মান ভাষায় কী সব উপদেশ দিয়ে কলারটা ছেড়ে দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলল, এ খুব ভালো কুকুর। এ জার্মানিতে দু'বছর স্কুলে পড়েছে।

স্কুলে পড়েছে? কুকুর বাতিকগ্রস্তদের মুখে তাদের কুকুরের নানা গুণপনার কথা শুনেছি আগে, কিন্তু ইস্কুলে পড়ানোর কথা কখনো শুনিনি। তারপরেই বুঝতে পারি। অর্থাৎ এটা একটা ট্রেনিং দেওয়া পুলিশ-কুকুর। আরো ভয় ধরে যায়। শুনেছি, হিটলারের জার্মানিতে নাৎসীদের ট্রেনিং দেওয়া 'ডবারমান' না কী জাতের কুকুর যেন ইহুদীদের ধরে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। এটা কি সেই জাতের একটা কিছু নাকি!

ছেলেটি কুকুর সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল, আমি শুকনো ভদ্রতা জানিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। সকালবেলার প্রসন্নতা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। গুম হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। একটা কুকুরকে দেখে ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠা একজন পুরুষ মানুষের পক্ষে বোকার মতন কাজ—কিন্তু একটা কুকুরই বা

সে রকম ভয় দেখাবে কেন? সেই জন্য আরো বেশি রাগ হয়।

সুটকেসটা খুলে জিনিসপত্র গুছোতে শুরু করলাম। সেই সময়েই বোটের মালিক বৃদ্ধটি আবার এসে জানলা দিয়ে উঁকি মারল।

হাসি মুখে বলল, সাব, কুকুরটা আপনাকে খুব বিরক্ত করছিল তো? এ কুকুর দেখলে আমাদেরই ভয় লাগে। এই সাহেব তো কুকুর নিয়ে পাগল! জার্মানি থেকে গাড়ি করে ঐ কুত্তাকে নিয়ে এসেছে। নিজের হাতে খাওয়ায়। সাহেব নিজে আমাদের রান্না খায়, কিন্তু কুকুরের খাবার সব গাড়িতে আছে। একদম জার্মান মাল। এত এত টিনের কৌটো। কুকুরকে রেখে কোথাও যায় না, রাত্রে ঐ কুকুরের সঙ্গে ঘুমোয়—

আমি বললাম, আমার কত চার্জ হয়েছে বলুন তো। আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাবো।

বৃদ্ধ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, চলে যাবেন? কেন সাব? আমরা কী দোষ করেছি?

—আমার এখানে ভালো লাগছে না।

বৃদ্ধ জানলার মধ্য দিয়ে আধখানা শরীর গলিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল, ঐ কুকুরের জন্য? আমি সাহেবকে বলে দেব, ঐ কুকুর আপনার কাছেও আর আসবে না...আপনি আমাদের মেহমান...আপনি চলে গেলে আমাদের পাপ হবে—

আমি বললাম, হাউসবোটে কুকুর রাখার কোন নিয়ম আছে? এরকম কুকুর রাখার জন্য লাইসেন্স লাগে না?

—কুকুর তো এখানে থাকে না—গাড়িতে থাকে, ঐ তো দেখুন না, মাঠের মধ্যে সাহেবের ভ্যান গাড়ি আছে।

—তবে যে এই মাত্র বললেন, ঐ সাহেব কুকুরের সঙ্গে শোয়! কুকুর হাউসবোটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। আমি টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, এ রকম নিয়ম আছে কিনা। ব্যাপারটা কী? এক হাউসবোটে শুধু সাহেব মেম ন্যাংটো হয়ে থাকবে বলে আমরা থাকতে পারব না। আর এক জায়গায় এরকম হিংস্র কুকুর তাড়া করে আসবে। তা হলে নাগিন লেকটা কি শুধু সাহেবদের জন্য? আমাদের, মানে ভারতীয়দের থাকার জন্য নয়? সে কথা আগে বলে দিলেই হয়!

এত কড়া সুরে কথাগুলো বলাই আমার ভুল হয়েছিল। বৃদ্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আমার পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, আমাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না, আমি যা চাই, আমার যা ভালো লাগে, তাই সে করবে, আমি অতিথি—অতিথি যদি রাগ করে চলে যায় তবে

তার চেয়ে দুঃখের কথা কাশ্মীরীদের কাছে কিছু নেই, টাকা পয়সা কিছু নয়, ইজ্জতই আসল—ইত্যাদি।

বুঝলাম, আমি টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টে গিয়ে নালিশ করব শুনেই ও এত ভয় পেয়েছে। এরা গভর্নমেন্টকে বেশ ভয় পায়।

বৃদ্ধের কান্না মেশানো অনুনয় কিছুতেই আর থামে না। কান্না আমার সহ্য হয় না একদম। বিশেষত কোন বৃদ্ধলোকের কান্না শুনলে আমার গা রি রি করে। এ সময় কঠোরভাবে এর হাত ছাড়িয়ে উঠে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কান্না থামাবার জন্য আমাকে বাধ্য হয়েই বলতে হল, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি না, থাকছি।

বৃদ্ধ এবার চোখের জল মুছে বলল, আপনি বিশ্বাস করুন, সাব, ঐ সাহেবকে আমি কুকুর নিয়ে থাকার জন্য প্রথমে সত্যিই আপত্তি করেছিলাম। প্রথম দিন আমাকেও কামড়ে দিয়েছিল, এই দেখুন না, দাগ।

—আপত্তি করেছিলেন, তাও থাকল কেন?

—কী করব বলুন, কিছুতেই আমার কথা শুনল না। এই জায়গাটা পছন্দ হয়েছে, তাই থাকবে।

বোটের মালিক আপত্তি করলেও থাকবে? চালাকি নাকি? নিশ্চয়ই বেশি টাকা দিতে চেয়েছে, আর তাতেই আপত্তি-টাপত্তি সব ভেসে গেছে। ঐ সাহেবটির দেশে কোন হোটেলে গিয়ে যদি আমি এরকম কোন নিয়ম ভঙ্গ করতাম, তা হলে থাকতে দিত একদিনও! আমি জানি, দেয় না।

সাহেবরা সুসভ্য জাতি। কিন্তু ওরা শুধু সভ্য ওদের নিজেদের দেশে—বাইরে এলেই ওদের কদাকার অসভ্যতা প্রকাশ পায়। সেই জন্যই এক সময় কলোনিগুলিতে ওরা বীভৎস রকমের অসভ্যতা দেখিয়েছে। তখন অসভ্যতা করত গায়ের জোরে, এখন টাকায়। ওরা জানে, ওদের কারুর একটা ব্যবহৃত ক্যামেরা কিংবা এক প্রস্থ পোশাক এখানকার কারুকে দান করলেই সে ধন্য হয়ে যাবে।

যাই হোক, আমাকে ঐ নাগিন লেকেই থেকে যেতে হল।

৩

দিন আষ্টেক কেটে গেছে ওখানেই। এক ধরনের আলস্যও আমাকে পেয়ে বসেছে, আর কোথাও চট করে চলে যেতেও ইচ্ছে করে না। সারাদিন ছাদে শুয়ে শুয়ে

রোদ পোহাই, কখনো হাতে থাকে বই, কখনো চারপাশে তাকিয়ে এদের সব অদ্ভুত কীর্তিকলাপ দেখি। অনেক সময়েই মনে হয়, আমি যেন ভারতবর্ষে নেই, এই জায়গাটা যেন ইটালি বা সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র। যদিও এমন বিপুল ব্যাপ্ত, তুষারমণ্ডিত পাহাড়শ্রেণী পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

এখান থেকে যাবার মতন আরো দু' একটা উপলক্ষ ঘটেছিল। আমি আসবার দু'দিন পরেই তিনটি মেয়ে, দু'জন জার্মান ও একজন আমেরিকান এক শিকারায় চেপে এখানে এসে হাজির। জার্মান যুবক দুটির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল ইস্তাম্বুলে। এখন তারা থাকে ডাল হ্রদে, সেই জায়গাটা তাদের পছন্দ নয়। মেয়ে তিনটির সঙ্গে পুরুষ কেউ নেই। তারা নিজেরাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সদ্য বিশ্ব নারীবর্ষ হয়ে গেল। ডাল হ্রদে তাদের বসবাসের অসুবিধের ঠিক কারণটা অবশ্য বোঝা গেল না, তবে সেখানে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের ভিড়ই বেশি, মনে হয় তারা স্ববর্ণের সঙ্গীদের কাছে থাকতে চায়।

তিনজনের থাকার জায়গা নেই। একটা ঘরে তারা দু'জনে মাত্র থাকতে পারে কিন্তু তারা তিনজনেই অবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ইচ্ছুক। বসবার ঘরে বৃদ্ধের সঙ্গে তাদের বহুক্ষণ আলোচনা চলল। দু'একবার আমি বসবার ঘরের মধ্য দিয়ে যাই, অমনি তাদের আলোচনা থেমে যায়, সবাই চুপ করে আমার গমন পথের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকে। বুঝলাম, আমার অবস্থা যাকে বলে, কাবাব মে হাড্ডি। কিংবা একদল হংসের মধ্যে এক কাক। ওদের তুলনায় আমার গায়ের রং সেরকমই তো।

বৃদ্ধকে আমি ডেকে বলেছিলাম, ওরা যখন থাকতে চাইছে, তখন আমার ঘরটা ছেড়ে দিলেই তো হয়!

আমি তো অন্য যে-কোন জায়গায় চলে যেতে পারি!

বৃদ্ধ অমনি হা-হা করে উঠেছিল। আমার চলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্য সবাই চলে গেলেও আমাকে একা থাকতে হবে এখানে। বৃদ্ধের অনুনয় বিনয়ের মধ্যে নিছক স্বার্থ নয়, ক্রমশ যেন খানিকটা আন্তরিকতার স্পর্শও পাই।

ফলে, একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল। সেই তিন মেম রয়ে গেল এক ঘরে। বেশি পয়সা দিয়ে এরকম গাদাগাদি করে থাকা এদের স্বভাব নয়, তবু কেন রয়ে গেল কে জানে। অবশ্য রাত্রের দিকে তারা জার্মান যুবক দুটির সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করে কিনা, তা আমার জানার কথা নয়।

দিনের বেলা বেশির ভাগ সময়েই ওরা বসবার ঘরটা অধিকার করে থাকে। আমি আর পারতপক্ষে ওদিকটা মাড়াই না। কখনো যাতায়াতের পথে ওদের সঙ্গে

দেখা হলে শুষ্ক সৌজন্যমূলক দু'একটা কথা হয় মাত্র, ওদের সঙ্গে আমার ঠিক ভাব হয় না। ওদেরও তেমন আগ্রহ নেই ভাব করবার।

কাছাকাছি মানুষজন রয়েছে অথচ তাদের সঙ্গে আলাপ হয় না—এমন অবস্থায় একটা অদ্ভুত একাকিত্ব বোধ আসে। খানিকটা অভিমান মেশান একাকিত্ব। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি এটা বেশ উপভোগ করতে থাকি, নিজেকে আরো বেশি অভিমানী করে তুলি। আমার প্রয়োজন নেই আর কারুকে। আমি শুধু দেখে যাব। এ পৃথিবীতে সবাই সব কিছু পায় না। কিন্তু দেখার তো কোন বাধা নেই!

জানলায় বসে বসে চারপাশের একটি ছোটোখাটো জগতের খুঁটিনাটি ঘটনাও আমি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করে যাই।

এখানে পাশাপাশি তিন চারটি হাউসবোট, সবাই মিলে বেশ একটা যৌথ সংসারের মতন। আমাদের বোটের বৃদ্ধকে স্থানীয় ছেলে বুড়ো সবাই বাবা বলে ডাকে। বাবা ওর ডাকনাম। এই বাবা দারুণ পরিশ্রমী, সব দিকে এর তীক্ষ্ণ নজর, এমনকি ঠিক সময়ে জার্মান সাহেবের কুকুরের স্নানের জন্য গরম জল তৈরি করে দেওয়া পর্যন্ত। হ্রদের জল নোংরা বলে আমরা সেদ্ধ জল ছাড়া কিছুই পান করি না, কিন্তু ছোট ছোট কাশ্মিরী ছেলেমেয়ে ভোরে উঠে এই হ্রদের জলেই দাঁত মাজে, মুখ ধোয়। তাদের স্বাস্থ্য চমৎকার। ঐ জলেই তারা দাপাদাপি করে সাঁতার কাটে। তাদের ফুটফুটে চেহারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। একদিন দুপুরবেলা বেরিয়ে আমিনা কাদালের কাছে একটি মেয়ে ইস্কুলের ছুটি হতে দেখেছিলাম। সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষের আর কোন জায়গার মেয়ে-ইস্কুলে এক সঙ্গে এত সুন্দরী মেয়ে পড়ে না। প্রকৃতি যেখানে এত সুন্দর, মানুষও সেখানে সুন্দর হয়।

কাশ্মীরীদের আর একটা গুণ, তারা কেউ বড় একটা চেঁচিয়ে কথা বলে না। এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মৃদুভাষী। পথে-ঘাটে লোকজনের ঝগড়ার দৃশ্য বড় একটা চোখে পড়েনি। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্যে যে শান্ত গাম্ভীর্য আছে, এখানকার মানুষের মধ্যেও তার প্রভাব আছে মনে হয়। এর একটি ভালো প্রমাণ পেয়েছিলাম আর একদিন বিকেলে।

শ্রীনগরে 'চার চিনার' নামে দুটি দ্বীপ আছে। এর মধ্যে বড় চার চিনারে মদ্যপানশালা এবং অন্যান্য আকর্ষণ থাকায় ভ্রমণকারীদের খুব ভিড় হয়। ছোট চার চিনারে সে রকম কোন আকর্ষণ নেই। তাছাড়া জায়গাটা বেশ দূর বলে সচরাচর কেউ যায় না। একদিন সন্ধেবেলা সেখানে শিকারায় চেপে উপস্থিত হয়ে দেখি, পনেরো-ষোলোজন লোক মাটিতে বসে নামাজ পড়ছে। তাদের কারুর মুখে কোন শব্দ নেই, কখনো উঠে দাঁড়ায়—সকলেই একসঙ্গে। কেউ কোন নির্দেশ

দেয় না, চারপাশে পাহাড় ও জলঘেরা সেই ছোট দ্বীপে সেই নিঃশব্দ প্রার্থনার দৃশ্য আমার শরীরে একটা শিহরন এনে দেয়। মনে হয় যেন সব ব্যাপারটাই অপ্রাকৃত।

প্রার্থনাকারী ছাড়া আরো আট-দশজন মানুষ সেই দ্বীপটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। তার মধ্যে দু' জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। বাকি লোকরা নিঃশব্দে কফি পান করছে। দ্বীপের একটি মাত্র দোকানে কফি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

দ্বীপ ভর্তি রাশি রাশি ফুল। সপ্তবর্ণের সমস্ত সমাহার তারা ফুটিয়ে রেখেছে। আমি কিছুক্ষণ ফুল গাছগুলির পাশ দিয়ে দিয়ে ঘুরি, তাদের গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে আদর করি। 'যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে'—এই লাইনটা আমার মাথার মধ্যে ভোমরার মতন গুণগুণ করে—এবং এত বেশিবার ঐ লাইনটা আমাকে শুনতে হয়—মাথার মধ্যে কে যে ওটা সুর দিয়ে গাইছে তাও জানি না—আমি এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এক সময় এক কাপ কফি নিয়ে আমিও একটা বেঞ্চে বসলাম।

সেখানে আর দুটি যুবক বসেছিল। তাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ হল। তারা দু'জনেরই কলেজের ছাত্র। তাদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি হঠাৎ এই চার চিনারে এলেন যে? এখানে তো কেউ আসে না, কিছু তো দেখবার নেই।

আমি আঙুল তুলে দেখিয়ে বললাম, কেন—এই যে এত ফুল!

সে বলল, ফুল তো কাশ্মীরের সব জায়গাতেই। আপনি মোগল গার্ডেনসগুলো দেখেছেন? সেখানে অনেক বেশি ফুল আছে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, তোমরা এখানে এসেছ কেন ভাই?

অন্য ছেলেটি বলল, জায়গাটা কী রকম অসম্ভব শান্ত দেখেছেন? যেন একটি শান্তির পর্দা ঝোলান আছে চারদিকে। সেইজন্য আমরা প্রায়ই এখানে এসে বসে থাকি!

আমি সকৌতুকে বললাম, ভাই, তোমরা কবিতা লেখো বুঝি?

ছেলে দুটি জানাল, না, তারা কবিতা লেখে না। দুজনেই বিজ্ঞানের ছাত্র!

এই ছেলে দুটি মুসলমান। কিন্তু তারা আধুনিক কলেজে পড়া যুবক বলে ঐ দূরের নামাজ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি। আমার শিকারাওয়ালা কিন্তু এসেই ঐ নামাজীদের মধ্যে বসে পড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান পড়া দুটি কলেজের ছেলে শুধু শান্তিময় নিস্তব্ধতা উপভোগ করার জন্য এই দ্বীপে আসে—একথা জেনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই! এই সময়ে তাদের রাজনীতি, সিনেমা, সাহিত্য কিংবা নারীর

প্রত্যঙ্গ নিয়ে হই-চই আলোচনায় মেতে থাকা উচিত ছিল না?

এই উপত্যকাবাসীরা হিমালয়ের প্রগাঢ় স্তব্ধতাকে শ্রদ্ধা করে। সেই জন্য তারা পারতপক্ষে উঁচু গলায় কথা বলে না। তবু মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয়। তখন বিমান আর কামানের গর্জনে সব নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়!

আমাদের ঠিক পাশের হাউস-বোটের বিদেশিনী মেয়েটি সত্যিই দ্রৌপদী। ইতিমধ্যেই আমরা তাকে 'নাগিন সুন্দরী' আখ্যা দিয়েছি। নাগিন লেকে যত হাউসবোট কিংবা নাগিন ক্লাব নামের হোটেলেও যত মেয়ে এসেছে, তার মধ্যে এর চেয়ে সুন্দরী আর কেউ নেই। সকাল থেকে অনেকক্ষণ মেয়েটি সারা গায়ে ক্রিম মেখে বোটের ছাদে প্রায় নগ্ন অবস্থায় শুয়ে থাকে, তার পাশে দুটি সমবয়সী যুবক অবিরাম নানারকম হাস্য পরিহাস করে তার মন ভালো রাখে। দুপুরের দিকে মেয়েটি জলের ওপর স্কিয়িং করতে যায় মধ্য হ্রদে, তখনও যুবক দুটি থাকে তার দু পাশে। বস্তুত এমন একটা মুহূর্তও আমরা দেখিনি, যখন মেয়েটির দু' পাশে ছেলে দুটি নেই। সব সময়ে দু'জনেই থাকে। কখনো একজন নয়। এমনকি, রাত্রে যে ওরা তিনজন এক সঙ্গেই শোয়, সেটাও এ-পাড়ায় আমরা সবাই জেনে গেছি। কেউ অবশ্য এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করে না। আমার একটু অদ্ভুত লাগে। প্রেম, ঈর্ষা—এই সব ব্যাপারগুলোও আস্তে আস্তে কী রকম বদলে যাচ্ছে! প্রেমিক-প্রেমিকা বললে সব সময় দু'জনকে বোঝায়, কিন্তু এরা তিনজন। অথচ কোন অশান্তি নেই।

আমার পাশের ঘরের দুটি মেয়ে অনর্গল জার্মান ভাষায় কী সব বলে যাচ্ছে। এরা বেশ জোরে জোরে কথা বলে। কাশ্মীরীদের নম্র গলায় কথা বলার ধরন এরা অনুকরণ করতে শেখেনি। এরা হয়তো ভাবে সেটা গরীব লোকদের বিনয়।

ক'দিন ধরেই শুনছি, ওরা ট্রাউট ফিসিং-এর তোড়জোড় করছে। সেই জন্য ঘোরাফেরা করছে কয়েকটি কাশ্মীরী যুবক। ইটালিতে যাদের জিগোলো বলে, সেই রকম কিছু ছেলে তৈরি হয়েছে এখানেও। পুরুষ সঙ্গীহীন মেমসাহেবদের তারা নানান জায়গায় নিয়ে যায়, সব ব্যবস্থাপনা করে দেয়। ট্রাউট মাছ ধরার জন্য কোন নির্জন পাহাড়ের খাঁজে ঝরনার পাশে অপেক্ষা করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দু'এক রাত্রি থাকতেও হয় তাঁবু খাটিয়ে। এই সব ছেলেরা মেমদের নিয়ে যায় সেইসব জায়গায়, ফুট ফরমাস খাটে, রান্না করে দেয়, মাছ ধরার ব্যাপারটাও মব্বই ভাগ তারাই সারে—তারপর গহন পাহাড়ের শীতে-কাঁপা রাতে তারা মেমদের শয্যাসঙ্গীও হয়। তার বদলে উপহার পায় ক্যামেরা, কম্বল আরো টুকিটাকি জিনিস। কাশ্মীরী ছেলেদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় উপহার অবশ্য সবুজ রঙের ডলারের নোট, তারপরই বিদেশী ছিপ। শ্রীনগরে ডলারের ব্ল্যাক মার্কেটের ঢালাও

বাজার আছে। এবং হাউসবোট কর্মচারী যে-কোন সুদেহী কাশ্মীরী যুবকই তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে দু'তিনটি বিদেশী ছিপ অন্যদের দেখায়।

প্রায়ই দেখি, বিভিন্ন হাউসবোটের ছেলেমেয়েরা ট্রাউট ফিসিং অভিযানে যাচ্ছে। এরা অনেকেই নিজের দেশে কক্ষনো মাছ ধরেনি। কিন্তু কাশ্মীরে এসে ট্রাউট ফিসিং বিদেশীদের অবশ্য কর্তব্যের একটি।

এই জার্মান মেয়ে দুটি চায় জার্মান ছেলে দুটিও তাদের সঙ্গে যাক। কিন্তু ছেলে দুটি রাজি নয়, কারণ কিছুদিন আগেই তারা মাছ-শিকার সেরে এসেছে। তবু মেয়ে দুটি তাদের পেড়াপিড়ি করছে রোজই। আমেরিকান মেয়েটি অবশ্য বই-ভক্ত, তার ওদিকে বেশি ঝোঁক নেই। জার্মান মেয়ে দু'টিকে দেখতে ভালো নয়. বিদেশী সৌন্দর্যের মাপে ওদের পা-গুলি মোটা মোটা এবং গালের মাংসে চোখ ঢেকে গেছে। আহা, বেচারীদের বিয়ে হবে না। তাই এত দূরে এসেছে প্রণয়ের সন্ধানে। ইস, ওরা যদি মাছ ধরার সঙ্গী হিসেবে আমাকে নিত!

ঘর থেকে বেরুবার সময় এখনো আমাকে সাবধানে চারদিকটা উঁকি মেরে দেখে নিতে হয়। জার্মান কুকুরটা এখনো আমাকে জ্বালাতন করতে ছাড়ে না। অতি পাজী কুকুর ওটা, অন্য লোকজন কাছাকাছি থাকলে ও আর এখন আমাকে কিচ্ছু বলে না, নিরীহভাবে লেজ নাড়ে। কিন্তু কোন সময় আমাকে একা পেলেই গ্রাউ গ্রাউ করে তেড়ে আসে। সেই ডাক শুনলেই রক্ত হিম হয়ে যায়।

এত লোক থাকতে কুকুরটা শুধু আমার দিকেই বা তেড়ে আসে কেন? আমি জীবনে নিশ্চয়ই অনেক অপরাধ করেছি, কিন্তু একটা জার্মান পুলিশ-কুকুর সেকথা জানবে কী করে? এটা বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

দুপুরবেলা কিনে-আনা খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে পড়া হয়ে গেছে। নতুন বই দুটির একটিও প্রায় শেষ, আর ভালো লাগছে না, ব্যথা করছে চোখ। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মিরাজ দিল-এর একটা ছোট্ট নৌকো আছে, ডিঙ্গি বা শালতি বলা যায়। এই মাত্র সে মাছ-ধরা সেরে ফিরল। আমি বললাম, মিরাজ, তোমার নৌকোটা করে আমি একটু ঘুরে আসব? দেবে?

সে বৈঠাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ইয়েস্, সাব!

আমার নদীনালার দেশে জন্ম। এক সময় নৌকো চালাতে জানতাম। হঠাৎ আমার ইচ্ছে হলো, একলা একটু নৌকো নিয়ে ঘুরে আসতে।

কিন্তু বৃদ্ধ অর্থাৎ বাবা আমার কথা শুনতে পেয়েছে। সে তাড়াতাড়ি রান্না-কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, না, সাব। একলা যাবেন না। এ নৌকোটা যখন তখন উল্টে যায়। মিরাজ আপনার সঙ্গে যাক।

মিরাজ এই মাত্র মাছ ধরে ফিরেছে, এখন আমার সঙ্গে যেতে তার না-ও ইচ্ছে হতে পারে। বাবাকে আমি যত বোঝাই যে নৌকো উল্টে গেলেও ক্ষতি নেই, আমি যথেষ্ট সাঁতার জানি, সে কিছুতেই শুনবে না। আমার নিরাপত্তার সব দায়িত্ব যেন তারই। জোর করে মিরাজকে আমার নৌকোয় তুলে দিল।

মিরাজ ছেলেটি খুব ভালো। সব সময় তার হাসিমুখ। কথা কম বলে, হাসি দিয়েই অনেক কথা সেরে দেয়। এই ছেলেটি হয়তো সারাজীবন হাউসবোটের কর্মচারীই থেকে যাবে, অথচ চিত্রতারকা হলে ওকে চমৎকার মানাত।

জলের ওপর ছপ্ ছপ্ করে বৈঠার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ম্লান আলোয় সমস্ত পরিমণ্ডল যেন স্বপ্নময়। সূর্য ডুবে যাবার পরও এখানে অনেকক্ষণ আলো থাকে, এখন প্রায় আটটা বাজে, তবু অন্ধকার নামেনি। দূরের পাহাড়গুলি এখন মনে হয় চিত্রার্পিত। পুরো পাহাড়গুলি এখন আর দেখা যায় না, শুধু আকাশের গায়ে বসানো আছে সার সার তুষারমুকুট।

মধ্য হ্রদে এসে যেদিকে তাকাই, সব বোটেই সাহেব-মেম। এই ক'দিনে আমি এই বিদেশী পরিমণ্ডলে অনেকখানি ধাতস্থ হয়ে গেছি। তবু এত সব বিচিত্র চরিত্র যে, কিছুতেই একঘেয়েমি আনতে দেয় না। এখন আর এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবার কোন তাড়া অনুভব করি না। মন্দ কী!

নাগিন লেকের দূরতম প্রান্তে চলে আসি। এখানে আর হাউসবোট নেই। এখানে রয়েছে বেশ বড় একটি পদ্মবন। পদ্মবন? জলের মধ্যে এক সঙ্গে অনেক পদ্মলতা থাকলেও কি তাকে বন বলা যায়? তবে পদ্মবনে মত্ত হস্তী মানে কী?

রাশি রাশি রক্তকমল ফুটে আছে, এরা কারুর জন্য নয়। কোন পুজোতেই এ ফুল লাগে না এখানে। পদ্মবনে নাকি সাপ থাকে? কোন এক তিন প্রহরের বিলে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে—এরকম শুনেছিলাম ছেলেবেলায়। তা আর কখনো দেখা হয়নি।

একটা পদ্মের মৃণাল ধরে টান দিলাম। ওরে বাবা, কী দারুণ লম্বা এগুলো। এখানে জল বেশ গভীর, প্রায় তলা পর্যন্ত দেখা যায়। বেশ শক্ত মৃণালগুলো, সহজে ছেঁড়া যায় না। বেশ জোরে টানতেই নৌকোটা প্রায় উল্টে যাচ্ছিল আর কি! মিরাজ পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছুরি বার করে কচ্ করে কেটে দিল ডাঁটাটা। সেটা আমার খুব পছন্দ হলো না। অনেকে কাঁচি দিয়ে গোলাপ ফুলের ডাল কাটে, সেই দৃশ্যটা আমার দেখতে ভালো লাগে না কখনো।

নৌকোর দু'পাশে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রেখে আর একটা পদ্ম ছেঁড়ার চেষ্টা করলাম। এবার উঠে এল বিরাট একটা নাল। মিরাজও পটাপট কয়েকটা তুলে ফেলল। ওরা নাকি এগুলো রান্না করে খায়। দেখতে দেখতে প্রায় এক

নৌকো ভর্তি পদ্ম তোলা হলো। মিরাজেরই উৎসাহ বেশি।

হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই টপাটপ করে কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল গায়ে। পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কোথা থেকে চলে এসেছে মেঘ। মিরাজ বলল, ফিরে যাব, সাব ?

আমি ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

দুজনে বৈঠা চালাতে নৌকো বেশ তাড়াতাড়ি এগোতে লাগল। মিরাজ বাচ্চা ছেলে হলেও বেশ দক্ষ মাঝি। অনভ্যাসের জন্য আমার একটু বাদেই হাত ব্যথা করে।

অনেকখানি চলে এসেছি। এমন সময় একজন কে চেঁচিয়ে বলল, এই, আমায় একটা পদ্মফুল দেবে, এই, দেবে একটা পদ্মফুল ?

একটি বাচ্চা মেয়ের গলা। বাংলায়। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, একটা হাউসবোট থেকে একটি চার-পাঁচ বছরের বালিকা আমাদের ডাকছে।

৪

এই বাচ্চা মেয়েটিকেই আমি সেদিন দুপুরবেলা টুরিস্ট অফিসে দেখেছিলাম।

হাউসবোটটির দিকে আমার পিঠ ফেরান ছিল, সুতরাং আমাকে নিশ্চয়ই বাঙালি বলে চিনতে পারেনি। তবু যে মেয়েটি বাংলায় পদ্মফুল চাইছে, তার কারণ অতটুকু মেয়ে বাংলা ছাড়া আর কিছুই জানে না। নাগিন লেকে আমি এই প্রথম বাংলা কথা শুনলাম।

মিরাজ কিছুই বুঝতে পারেনি। আমি তাকে বললাম, ঐ হাউসবোটের কাছে একটু চলো তো।

লাল রঙের কোট পরে বাচ্চা মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে হাউসবোটের বারান্দায়। আমি তার কাছে গিয়ে একগোছা পদ্ম ফুল এগিয়ে দিয়ে বললাম, এই নাও !

মেয়েটি সব ফুলগুলো নিয়ে আবার এক হাত বাড়িয়ে বলল, আরো দাও ! আরো তো অনেক আছে !

বেশ দুষ্টু মেয়ে তো। অল্পে সন্তুষ্ট নয়।

আরো কিছু ফুল তুলে দিলাম ওকে।

এই সময় ভেতরে বসবার ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। চিনতে দেরি হলো না। এক দুপুরে দেখা সেই মিসেস চ্যাটার্জি, যিনি একবার রাগের সঙ্গে চেঁচামেচি এবং খানিক পরেই কাঁদছিলেন। এখন মুখখানা গম্ভীর। সাদা রঙের

শাড়ির ওপর একটা মেরুন অল ওভার শাল জড়ানো।

প্রথমে তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে মেয়েকে ঈষৎ ধমক দিয়ে বললেন, কী হবে অত ফুল নিয়ে? একটা রেখে বাকি সব ফেরৎ দিয়ে দাও!

আমি বললাম, নিক না। আমার এত ফুলের কোন দরকার নেই, এমনিই তুলেছি। আরো অনেক রয়েছে।

তিনি তবু আমার দিকে না তাকিয়ে মেয়েকে আবার বললেন, লোকের কাছে কখনো এরকমভাবে জিনিস চাইতে নেই। কতবার তোমাকে বলেছি! দাও, ফেরৎ দিয়ে দাও!

ঐটুকু বাচ্চা মেয়ের কাছ থেকে ফুল ফেরৎ নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, কিচ্ছু হয়নি তাতে। ওকে বকবেন না। আর তো কিছু চায়নি, ফুল চেয়েছে।

এবার তিনি পরিপূর্ণভাবে তাকালেন আমার দিকে। মুখখানা বিষণ্ণ উদাসীনতা মাখানো। একত্রিশ-বত্রিশের মতন বয়েস, সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় বেশ লম্বা।

তিনি অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে তাকিয়ে চেয়েই রইলেন। আমার একটু অস্বস্তি হলো। সেটা কাটাবার জন্য আমি দু' হাত তুলে বললাম, নমস্কার।

এবার তিনি বলেন, আসুন। ওপরে আসুন!

কথাটার মধ্যে তার খানিকটা হুকুমের সুর আছে। সাধারণ ভদ্রতা বা অনুরোধ নয়।

প্রত্যেক হাউসবোটের সামনের বারান্দা থেকে একটা সিঁড়ি নামানো থাকে জল পর্যন্ত। সেটা দিয়ে আমি বারান্দায় উঠে এসে জানালাম, আমি একটু দূরেই একটা বোটে থাকি।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার কি ফেরার কোন তাড়া আছে? একটু চা খাবেন?

—না তাড়া নেই, খেতে পারি।

মিরাজকে বললাম, তুমি যাও, একটু পরে আমি একটা শিকারা নিয়ে ফিরব!

সে বলল, না সাব। আমি থাকছি।

মিরাজের ওপর 'বাবা' আমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে। সে আমাকে ফেলে যাবে না। কিন্তু ছেলেটিকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখব। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললাম, এখানে তো অনেক শিকারা পাওয়া যাবে, আমি পরে ফিরব।

এই বোটেও দুটি সাহেব মেম রয়েছে। তবে তাদের দেখলে মনে হয় বেশ নিরীহ বিয়ের পর বেড়াতে আসা দম্পতি। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোন পুরুষ

নেই। বেশ চমৎকৃত হলুম। বাঙালি মেয়েরাও তাহলে একলা বেড়াতে আসতে পারে, সঙ্গে আবার একটি পাঁচ বছরের শিশু। এই মহিলার সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ইনি ওরকমভাবে প্রকাশ্যে কাঁদছিলেন কেন?

আমি বললাম, এই জায়গাটায় আমি আর আপনারা ছাড়া কোনো বাঙালি নেই। ভারতীয়ও নেই। আপনি এখানে এলেন কী করে?

উনি বললেন, আমার ইচ্ছে ছিল টুরিস্ট সেন্টারে থাকার। শহরের মাঝখানে। কিন্তু সেখানে জায়গা নেই—কোন বড় হোটেলেও জায়গা নেই—তিন চার দিন ধরে অসম্ভব টুরিস্টের ভিড়। মির্জা আলী বলে একজন এখানে নিয়ে এলো। জায়গাটা তো ভালোই। কিন্তু নিরাপদ তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ। সে রকম কোন ভয়টয় নেই। চুরি যায় না এখানে। তবে জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

মির্জা আলীও একটি জিগোলো। আমাদের হাউসবোটের জার্মান মেয়ে দুটিকে ট্রাউট ফিসিং-এ নিয়ে যাবার জন্য সেও দু' একবার আনাগোনা করেছে। একা এই সুন্দরী মহিলাকে কি সে সেই রকম কোন মতলবেই এনেছে?

বারান্দাতেই চেয়ার টেনে বসা হলো। আমরা পরস্পর নাম ও বাসস্থান সম্পর্কে তথ্য বিনিময় করলাম। ভদ্রমহিলার নাম শুভ্রা চ্যাটার্জি, দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি পাটনায়। ওঁর মেয়ের নাম মৌসুমী, ডাকনাম বুলবুল। দারুণ ছটফটে মেয়ে, সে সারা হাউসবোট দাপাদাপি করে দৌড়োচ্ছে। এক একবার দুটি তিনটি করে ফুল নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের ঘরে, আবার ফিরে আসছে।

ট্রেতে সাজিয়ে চা দিয়ে গেল মির্জা আলী। আমাকে দেখে সে একটি লম্বা সেলাম জানাল। আমি এ তল্লাটে প্রায় আট-ন'দিন আছি এবং একমাত্র নেটিভ ভ্রমণকারী হিসেবে বেশ দ্রষ্টব্য হয়ে গেছি।

চা দেবার পরও মির্জা আলী পাশে দাঁড়িয়েছিল, ভদ্রমহিলা তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, আমাদের কিছু দরকার নেই। অর্থাৎ তিনি ওকে চলে যেতে বলছেন।

একটা প্রশ্ন গোড়ার থেকেই আমার জিভে সুলসুল করছে। উনি সেই দুপুরে ওরকমভাবে কেন কাঁদছিলেন? কিন্তু সে প্রশ্ন এখন উত্থাপন করা যায় না। ওঁর কোন দুর্বল মুহূর্তে ওঁকে দেখে ফেলেছি, সেটা জানালে উনি লজ্জা পাবেন।

আমাকে চা খাবার নেমন্তন্ন করলেন বটে, কিন্তু শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার সঙ্গে বিশেষ কথা বলছেন না। মুখে একটা অন্যমনস্কভাব। নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন।

আমিও খুব একটা বাক্যবাগীশ নই যে চটপট করে আলাপ জমিয়ে তুলব।

আমি ওঁর সুন্দর হাতের আঙুলগুলি লক্ষ্য করতে লাগলাম।

বেশ লম্বা লম্বা আঙুল, শিল্পীর মতন। ভদ্রমহিলার শরীরে কোন প্রসাধনের চিহ্ন নেই, কিন্তু একটা ঢলঢলে সৌন্দর্য টের পাওয়া যায়।

হঠাৎ মুখ তুলে উনি বললেন, আমার একটা জরুরি কাজে পহলগাম যাবার কথা। কিন্তু পহলগামের রাস্তায় ধস নেমেছে, বাস চলছে না। কতদিন যে অপেক্ষা করতে হবে! বিরক্তিকর!

জরুরি কাজ? কাশ্মীরে আবার কে কবে জরুরি কাজ নিয়ে আসে? ভদ্রমহিলা কি ডাক্তার না বিজ্ঞানী? তাদের কিছু কিছু সেমিনার হয় বটে শ্রীনগরে। এই সব সেমিনারের নিয়ম এই, গ্রীষ্মকালে হয় কোন পাহাড়ী জায়গায়, শীতকালে সমুদ্রতীরে। কিন্তু পহলগামের মতন ছোট্ট জায়গায় কিসের সেমিনার। তাছাড়া সেমিনারের অতিথিদের যাতায়াতের ব্যবস্থা তো সরকারই করে।

আমি বললাম, বাস না চললেও ট্যাক্সি করে যাওয়া যায়। খরচ খানিকটা বেশি।

উনি একটু রাগতভাবে বললেন, বাসের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে ট্যাক্সিই বা কি করে চলবে?

—পহলগামের রাস্তা অনেকখানিই সমতল। পাহাড়ী রাস্তা খুব বেশি নয়। সমতলে তো আর ধস নামবে না—পাহাড়ে যদি নামেও সেই পর্যন্ত ট্যাক্সিতে গিয়ে বাকিটা পথ ঘোড়ায় কিংবা পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়।

—আপনি পহলগাম ঘুরে এসেছেন?

—আগে একবার এসেছিলাম, তখন দেখেছি।

—এবার যাবেন না?

—যেতেও পারি। ঠিক নেই! আপনি এই প্রথম এসেছেন?

—হুঁ।

উনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছে, খোলাখুলি কথা হবে না। এবার বোধহয় আমার বিদায় নেওয়া উচিত!

—ওকি, ওকি, বুলবুল।

ভদ্রমহিলা ধড়মড় করে উঠে ছুটে গেলেন। আমিও চমকে উঠলাম। আমাদের কথার ফাঁকে বুলবুল কখন বারান্দার রেলিং টপকে জলের কাছে ঝুঁকেছে। সে জলের মধ্যে একটা পদ্ম ফুল ভাসাতে চায়।

উনি বুলবুলকে টেনে এনে ধমকালেন। তারপর বললেন, এ জায়গাটা এমনিতে মন্দ নয়। কিন্তু আমার ভয় এই মেয়েকে নিয়ে। এমন দুরন্ত, হঠাৎ যদি জলে-টলে পড়ে যায়—

আমি বললাম, এত ছোট বাচ্চা নিয়ে হাউসবোটে না থাকাই ভালো বোধহয়। আপনি কোথাও জায়গা পেলেন না? লালচৌকে একটা বড় বাঙালি হোটেল আছে। সেখানে কোনো বাঙালি গেলে, জায়গা না থাকলেও ওরা একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেয় শুনেছি।

শুভ্রা চ্যাটার্জি দৃঢ়স্বরে বললেন, ঐ ধরনের কোন ব্যবস্থা আমি পছন্দ করি না। টুরিস্ট সেন্টারে ঘর খালি নেই বলে কয়েকজন অফিসার তাঁদের বাড়িতে আমাদের জায়গা দেবেন বলেছিলেন। আমি রাজি হইনি। এখানে আর একটা মুশকিল, শহর থেকে অনেকটা দূর। এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যায়?

—পাড়ে নেমে খানিকটা গেলেই দেখবেন একটা কলেজ আছে। সেখান থেকে ট্যাক্সি পাবেন।

একটু হেসে আমি আবার যোগ করলাম, আমি গোটা কাশ্মীর উপত্যকাটাই খুব ভালো চিনি। ইচ্ছে করলে আমাকে গাইড রাখতে পারেন।

—আপনি একা?

—হ্যাঁ, একাই তো। আপনার সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আলাপও হয়নি।

—কলকাতায় কোথায় আপনার বাড়ি?

—গোলপার্কের কাছে। ব্রীজের পাশে।

—অরুণ রায়চৌধুরীকে চেনেন? অ্যাডভোকেট? তার স্ত্রী বন্দনা—

—চিনি না। পাড়ার কারুকে চিনি না—

—বন্দনা রায়চৌধুরী—এক সময় ভালো ব্যাডমিন্টন খেলত, খুব ভালো ছাত্রী ছিল, একটা অসুখে মাথার প্রায় সব চুল সাদা হয়ে গেছে এর মধ্যেই—

—ঠিক সামনা-সামনি চিনি না, ওঁর কথা শুনেছি। উনি কি রামকৃষ্ণ মিশনে ফ্রেঞ্চ পড়ান?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো ফ্রেঞ্চ জানে—

—বুঝেছি। উনি আমার ছোট মাসীর বন্ধু।

—আপনার ছোট মাসীর নাম কি!

—দীপান্বিতা—

—দীপান্বিতা? তাকে তো আমিও খুব ভালো চিনি! বন্দনা আমার পিসতুতো বোন, আমরা এক সঙ্গে পড়েছি। দীপান্বিতা লেডি ব্রেবোর্নে পড়ত না?

—হ্যাঁ!

—দীপান্বিতা তোমার মাসী হয়। তুমি তো তা হলে আমাকেও মাসী বলতে পারো!

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! তুমি? ভদ্রমহিলা হঠাৎ আমাকে তুমি বলতে

শুরু করে দিলেন? সাহস তো কম নয়! এইজন্যই প্রবাসে এসে আমার বাঙালিদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না। ঠিক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোন না কোন রকমের চেনাশুনোর সূত্র বার করার চেষ্টা। আমার একদম পছন্দ হয় না এসব। অনেকেই যেমন এক জেলার লোক হলেই দারুণ আত্মীয় হয়ে যায়।

আমি মৃদু গলায় বললাম, দীপান্বিতা আমার মাসী হলেও আমার চেয়ে বয়েসে ছোট।

—হোক না ছোট। তবু মাসী তো! কি রকম মাসী, আপন?

—মায়ের খুড়তুতো বোন।

—তা হলে তো আপনই হলো। দীপান্বিতাকে আমার নাম বলো, ঠিক চিনতে পারবে। বিয়ের আগে আমি তো হিন্দুস্থান পার্কে থাকতাম। মাত্র ছ' বছর হলো পাটনা চলে এসেছি।

আমি আড়মোড়া ভেঙে বললাম, এবার আমি উঠি।

কাছ দিয়ে একটা শিকারা যাচ্ছিল, হাতছানি দিয়ে সেটাকে ডাকলাম। এখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। জলের ওপর বিভিন্ন হাউসবোটের আলোর লম্বা লম্বা রেখা।

বুলবুল হঠাৎ আব্দার ধরল, সে শিকারায় চাপবে। তার মা তাকে বারণ করলেন। কিন্তু বুলবুল সে কথা শুনবে না। সে হাত পা ছুঁড়ে চ্যাচাতে লাগল, না, আমি শিকারায় চাপব, শিকারায় চাপব—এই কাকুটা আমায় নিয়ে যাবে—তুমি নিয়ে যাবে না?

অগত্যা আমাকে বলতেই হলো, ঠিক আছে, ওকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।

—কেন শুধু-শুধু—

—আসুক না, একটুখানি—আবার দিয়ে যাব।

বুলবুলকে আমি কোলে তুলে শিকারায় নিয়ে এলাম। তারপর শিকারাটা ছাড়ার পর আমার খেয়াল হলো বুলবুলের মাকেও তো অনুরোধ করা উচিত ছিল।

—আপনি আসবেন?

—না।

—আসুন না। একটু ঘুরেই ফিরে আসবেন?

—থাক্ তোমরাই ঘুরে এসো!

ওভ্রা চ্যাটার্জির তুমি সম্বোধন আমার গায়ে বিঁধছে। মেয়েদের এরকম বড়-বড় ভারিক্কী ব্যবহার আমার একদম সহ্য হয় না। এক অল্প-চেনা নারী আমায় তুমি বলছে? তাও মাসীর ভূমিকা!

বুলবুল কিন্তু একটুখানি ঘুরেই ফিরে আসতে রাজি নয়। শিকারা ঘোরাবার কথা তুললেই সে চেঁচিয়ে উঠছে, না, না, এক্ষুনি না, আমি আরো যাব!

শিকারাওয়ালা হাসছে। আমি বুলবুলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছি। যা দুরন্ত মেয়ে, একে সামলানোই শক্ত। পরের মেয়ের দায়িত্ব নেওয়াই এক ঝকমারি।

বুলবুল বায়না তুলল, ও আমার হাউসবোটটা দেখবে। সেটা না দেখিয়ে ওকে ফেরানো যাবে না বলেই শিকারাওয়ালাকে বললাম, চলো!

আমাদের হাউসবোটের সামনের বারান্দায় সেই জার্মান যুবক-যুবতীরা সকলেই এক সঙ্গে বসে বীয়ার পান করছে। সঙ্গে সেই কুকুর। বুলবুল সেখানে এসেই 'ওমা কী সুন্দর কুকুর' বলে অকুতোভয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি শিউরে উঠলাম। কুকুরটা অবশ্য বুলবুলের ছোঁয়ায় একটুও বিরক্ত হলো না।

জার্মান ছেলেমেয়েরা বুলবুলকে আদর করল, অনেক কথা জিজ্ঞেস করল তাকে। বুলবুল অনর্গল উত্তর দিয়ে গেল বাংলায়।

একটু পরেই তাকে আবার ফিরিয়ে দিতে গেলাম। বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্রা চ্যাটার্জি। তাঁর ছায়া পড়েছে জলে। পিঠের ওপর এক রাশ চুল মেলা। মুখখানা আবার বিষণ্ণ গম্ভীর। একটু আগে আমার সঙ্গে কথা বলার শেষ দিকে উনি খানিকটা উচ্ছল হয়ে গিয়েছিলেন। এখন মন আবার উধাও।

বুলবুলকে ওপরে তুলে দেবার পর উনি বললেন, ও খুব বিরক্ত করেছে নিশ্চয়ই।

—না, না, কিছু বিরক্ত করেনি। আমি চললাম।

উনি আর কিছু বললেন না।

শিকারাটা বেশ খানিকটা দূরে চলে আসার পর আমি আর একবার ফিরে তাকালাম। উনি তখনো এক দৃষ্টে জলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর পেছন দিকে হাউসবোটের আলো, সামনের দিকটা অন্ধকার। এত দূর থেকে আর মুখ দেখা যায় না।

কোন ছেলেই সাধারণত কোন মেয়েকে প্রথমে তুমি বলে না। শুভ্রা চ্যাটার্জির গাম্ভীর্য দেখে তাঁকে তুমি বলার কথা আমার মনেই পড়েনি। প্রথম আলাপে সে প্রশ্নই ওঠে না! তবু উনি কেন আমাকে তুমি বললেন? না, ওটা ঠিক হয়নি।

পরদিন আমার ঘুম ভাঙল জানলায় ঠকঠক শব্দে। চোখ মেলে দেখি, জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে 'বাবা'। মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজে। আমি তো আগেই বলে দিয়েছি, সাড়ে সাতটার আগে আমাকে বেড টি দেবার দরকার নেই।

একটু বিরক্তভাবে বললাম, কী?

বাবা বললো, সাব, আপনাকে এক ভাই ডাকছে।

—কে ডাকছে?

—এক ভাই।

ভাই আবার কি? আমার আবার কোন্ ভাই এখানে আসবে? যত সব অদ্ভুত কথা।

পাজামা গেঞ্জির ওপরেই শালটা জড়িয়ে নিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় আমার ভাই?

বৃদ্ধ সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, এক ভাই আপনার জন্য শিকারায় অপেক্ষা করছেন।

উঁকি দিয়ে দেখলাম, শিকারা নিয়ে এসেছেন শুভ্রা চ্যাটার্জি, আর তাঁর মেয়ে বুলবুল। তখন বুঝলাম, ভাই নয়, বাঈ। আমরা এদের কাছে এখনো সাব হলেও ভারতীয় মেয়েদের এরা মেমসাহেব বলে না। তারা বাঈ।

কিন্তু শুভ্রা চ্যাটার্জি ভোরে এসেছেন কেন? কোন রকমে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে মুখের চেহারাটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে বললাম, কী ব্যাপার? কোন গোলমাল হয়েছে?

শিকারায় শুভ্রা চ্যাটার্জির সুটকেস ও অন্যান্য জিনিসপত্র সাজান। সিংহাসনের মতন জায়গাটায় উনি বসে আছেন সোজা হয়ে। আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, আমরা আজই পহলগাম যাব ট্যাক্সি নিয়ে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে? তুমি পথঘাট চেন।

একটু থেমে উনি আবার যোগ করলেন, বুলবুল বার বার বলছে তোমার কথা। তুমি গেলে ও খুশি হবে।

আমি একটু হাসলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি তাঁর ব্যবহারে নিখুঁত থাকতে চান। তিনি একজন যুবতী, তিনি আমার মতন প্রায় একজন অচেনা মানুষকে ভ্রমণের সঙ্গী হতে আহ্বান জানাতে পারেন না। তাতে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সেই জন্যই তিনি তাঁর মেয়ের কথা বলছেন। যেন মেয়ের জন্যই তিনি অনুরোধ করছেন মাত্র।

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন, যদি তুমি যেতে চাও, তা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হয়ে নাও, আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।

মন স্থির করতে আমার কয়েক মুহূর্ত লাগল মাত্র। মিসেস শুভ্রা চ্যাটার্জি ইতিমধ্যেই নিজেকে ঘিরে অনেকখানি রহস্য সৃষ্টি করে ফেলেছেন। হঠাৎ প্রকাশ্য দিবালোকে কান্না, আবার গাম্ভীর্য, আমাকে হঠাৎ তুমি বলা—এ সবের অর্থ কী? এখনো, তিনি যেন আমাকে অনুরোধ করতে আসেননি, আদেশ করছেন। সুতরাং

শুভ্রা চ্যাটার্জিকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। এর শেষ দেখতে হবে।

তা ছাড়া, আমার মনের যে ক্ষত লুকোবার জন্য আমি একাকিত্ব চেয়েছিলাম, তা অনেকটা সফল হয়েছে। ঢের একাকিত্ব ভোগ করা গেছে এই ক'দিনে। এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়।

আমি বললাম, আমার তৈরি হয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগবে। ততক্ষণ শিকারায় বসে থাকবার দরকার নেই। ওপরে উঠে আসুন।

উনি বললেন, না, ঠিক আছে. আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।

এবার আমিই খানিকটা ধমক দিয়ে বললাম, কী ছেলেমানুষের মতন কথা বলছেন? আমার যদি আধঘণ্টা লাগে, ততক্ষণ জলের ওপর বসে থাকবেন মেয়েকে নিয়ে? মালপত্র থাক, আপনারা উঠে এসে ডাইনিং রুমে বসুন, আমি চা-টা দিতে বলছি। বুলবুল যদি দুধ খায়, তাও পাওয়া যাবে।

হাত বাড়িয়ে আমি বুলবুলকে তুলে নিলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে নিজেই ওপরে উঠলেন। অনেকটা যেন কোন রানীর মতন অহংকারী ভাব। ডাইনিং রুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বললেন, আমি শুধু, এক কাপ চা খাব, আর কিছু নয়, বুলবুল দুধ খেয়ে এসেছে।

একটি বাঙালি রমণীর সঙ্গে আমি চলে যাব শুনে বৃদ্ধ 'বাবা' আর কোন আপত্তি করল না। তাছাড়া সে বুঝে গেছে যে পর্যটন দপ্তরে গিয়ে আর নালিশ করার মতন মনের অবস্থা আমার নেই। আমি বেশি দিন রাগ পুষে রাখতে পারি না।

ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমাকে বিদায় জানাল। সবাই বার বার বলতে লাগল, সাব, আবার আসবেন। সাব, আবার এখানে আসবেন। এমন কি, মিরাজের বড় বোন, এতদিনে যার সঙ্গে একটাও কথা হয়নি, দূর থেকে দেখেছি শুধু, সে পর্যন্ত মৃদু গলায় বলল, সাব, আবার আসবেন তো!

এদের আন্তরিকতায় হঠাৎ মনটা খুব ভিজে যায়। সকলকে খুব আপন মনে হয়। মনে হয়, আবার ঠিক কোনদিন ফিরে আসব এখানে। কত জায়গায় গিয়ে এরকম কথা মনে হয়েছে। আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভুলিনি।

শমীমের বই দুটো ফেরৎ দিতে হবে, সে কথা বাবাকে ভালো করে বুঝিয়ে, তারপর টাকা পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

শিকারায় যেতে অনেকটা সময় লাগবে। কিন্তু আগে থেকে বলে না রাখলে এদিকে এত সকালে ট্যাক্সি পাওয়াও প্রায় অসম্ভব। ট্যাক্সি ধরার জন্য ডালগেট পর্যন্ত যেতে হবে।

নরম, সুন্দর সকাল। সোয়েটারের ওপর শাল জড়িয়ে নিয়েছি, তাও বেশ শীত করছে। তবে, আমি লক্ষ্য করেছি, কাশ্মীরে যতই শীত পড়ুক, কখনো হাড়ে

কাঁপুনি ধরে না। এখানকার তুলনায় দার্জিলিং-এর শীতে কষ্ট বেশি। শুভ্রা চ্যাটার্জি একটা লাল রঙের কোট পরেছেন। রংটা এত বেশি উজ্জ্বল যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে জল দেখছেন। চার পাশের পাহাড় চেয়ে আছে আমাদের দিকে। খুব কাছেই হরি পর্বত। ওখানে একটা পুরোনো কালের দুর্গ আছে। ভেবেছিলাম একদিন দুর্গটা দেখে আসব। আগেরবারও ভেবেছিলাম। দেখা হলো না।

নাগিন লেক পার হয়ে পড়লাম খালে। দু'পাশে অনেক গাছ জলের ওপর ঝুঁকে আছে। হঠাৎ মনে হয় বাঁশবন। কিন্তু সরু সরু পাতা হলেও এগুলো বাঁশ নয়, নাম-না-জানা গাছ। এই রকম গাছ-ঝুঁকে-পড়ার দৃশ্যের জন্যই মনে হয়, এই রকম খালের ওপর দিয়ে নৌকোয় চেপে আমি বহুবার গেছি, এ সবই আমার দেখা। শ্রীনগরের এই সব জায়গার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের খুব মিল। এই রকমই জলের ধারে ধারে বাড়ি, এই রকমই জল-মেশানো সংসার। তবে, এখানে পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা আছে বিশাল বিশাল বরফ-ঢাকা পাহাড়।

বুলবুল এসে আমার কোলের ওপর বসে পড়েছে। ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমি ঠিক ভাব জমাতে পারি না। অনেকে পারে। কিন্তু এই মেয়েটি নিজেই এত কথা বলে যে আমার দিক থেকে আলাদা কোন চেষ্টা চালাবার দরকার নেই।

বুলবুল বলল, কাকু, আমিও নৌকো চালাব। আমাকে একটা দাঁড় দিতে বলো না!

শিকারাওয়ালাকে সে কথা বলতেই সে সীটের তলা থেকে ছোট্ট একটা বৈঠা বার করে দিল। এর আগেও নিশ্চয়ই অনেক বাচ্চাই এরকম আবদার করেছে, তাই এরা তৈরিই থাকে।

বুলবুল সেই বৈঠাটা নিয়ে মহা উৎসাহে জল ছিটাতে লাগল। ঠাণ্ডা কনকনে জল আমার গায়ে লাগছে, বুলবুলের কোট ভিজে যাচ্ছে, তাকে বারণ করলেও সে আর থামছে না। এখন জল ছিটানোতেই তো তার আনন্দ। একে সামলানো আমার পক্ষে শক্ত।

আমি বুলবুলের মায়ের দিকে তাকালাম। তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। হাঁটুর ওপর থুতনি ঠেকিয়ে তিনি ওপাশের জলের দিকে তাকিয়ে আছেন। বোঝাই যায়, তাঁর মন নেই এখানে। মাত্র একদিনের আলাপের পর এত ভোরে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে পহলগাম যাবার প্রস্তাব জানানো যে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, এর পরও যে কিছু ব্যাখ্যা করার থাকে, তা নিয়েও উনি মাথা ঘামাচ্ছেন না। মনে হয়, ইনি হুকুম করায় বেশ অভ্যস্ত। ইনি যা বলবেন, সবাই তাই শুনবে। এই রকমই ইনি দেখে এসেছেন।

আমি ওঁকে ডাকলাম না। অনেক নারীকেই গম্ভীর অবস্থায় বিশ্রী দেখায়। সাধারণ অর্থে অনেক সুন্দরী মেয়েও যখন গোমড়া মুখে থাকে, তখন তাদের মুখখানা যে বাঁকা আয়নার মতন হয়ে যায়, তারা তা বোঝে না। কিন্তু এই উদাসীন গাম্ভীর্য শুভ্রা চ্যাটার্জির মুখে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। মনে হয়, এ জগতের নয়। আমি রূপের উপাসক, তাই ঐ রূপকে স্থির রেখে দিলাম।

শিকারা এখন চলেছে পুরোনো শহরের মধ্য দিয়ে। দু'পাশে বড় বড় বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ি থেকেই ঘাট নেমে এসেছে জল পর্যন্ত। আমি ভেনিস যাইনি, সেই নগরী কি এর চেয়ে বেশি সুন্দরী? এখানকার অনেক বাড়িই আগেকার দিনের সরু সরু ইঁটের, অপূর্ব কারুকার্য করা। হায়, এখন আর কেউ এরকম বাড়ি বানায় না। এখন বাড়ি মানে দেশলাইয়ের বাক্স।

কয়েক বছর আগে যখন শ্রীনগরে এসেছিলাম, তখন দেখেছি এই জলপথের দু'ধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত ভিখিরি বাচ্চারা। এমন কি সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির ফুটফুটে ছেলেমেয়েরাও আমাদের দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলত, রাজা সাব, সেলাম, দো পয়সা দেও। সেলাম রাজা সাব। ঝিলম নদীর ধারে এক সন্ধেবেলা একটি যুবতী নীরবে আমার দিকে ভিক্ষের হাত বাড়িয়েছিল, যাকে দেখে মনে হয়েছিল, এর রূপের কাছে সুচিত্রা সেন, বৈজয়ন্তীমালা লজ্জা পেয়ে যাবে। তবু এমন রূপসী ভিক্ষে করে কেন?

এবার শ্রীনগরে এসে একটাও ভিখিরি দেখিনি এ পর্যন্ত। এমনকি কোন হোটেল রেস্টুরেন্টের সামনেও কেউ ভিক্ষে চায় না। এজন্য একটু মনটা খুঁতখুঁত করে। ইওরোপ-আমেরিকাতেও আমি ভিখিরির সন্ধান পেয়েছি। আর ভারতবর্ষে ভিখিরি থাকবে না? এটা বড্ড বাড়াবাড়ি নয়?

একটা হেঁচকির শব্দে চমকে উঠলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি মুখ লুকোলেন। তবু স্পষ্ট বোঝা গেল, উনি কাঁদছিলেন। আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কোমরে-গোজা রুমাল বার করে চোখ মুছলেন।

বুলবুলও কান্নার শব্দ শুনেছে? সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, মা কাঁদছে কেন? ও কাকু। মার কি হয়েছে? বলো না, মা কাঁদছে কেন?

এই সব মুহূর্তে আমি বড্ড অসহায় বোধ করি। শুভ্রা চ্যাটার্জি কেন কাঁদছেন, সেটা উনি নিজে না বললে আমি কোনদিনই জিজ্ঞেস করব না। কারুর ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মধ্যে আমি কখনো অনুপ্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু এই ছোট মেয়েটিকে আমি কী বোঝাব!

আমি বললাম, ঐ দ্যাখো, জলের মধ্যে কী সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটেছে। এরকম জলের মধ্যে ফুলের গাছ আগে দেখেছ?

বুলবুল সেদিকে এক নজর তাকাল মাত্র। খুব একটা পছন্দ করল না। আবার মুখ ফিরিয়ে বলল, মা কাঁদছে কেন? বলো না।

—ঐ দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর মাছরাঙা পাখি? দেখতে পেয়েছ? একসঙ্গে তিনটে।

—হ্যাঁ, দেখেছি!

—তাকিয়ে থাক, দেখবে, এক্ষুনি একটা মাছ ধরবে!

—মা কাঁদছে কেন?

শুভ্রা চ্যাটার্জি এতক্ষণে সংযত হয়ে নিয়েছেন। তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, বুলবুল, তুমি মোজা ভিজিয়েছ? শিগগির মোজা খুলে ফেল!

বুলবুল অমনি চুপসে গেল। মিনমিন করে বলল, না, মোজা ভেজেনি, একটুখানি।

—বদলে নাও, শিগগির বদলে নাও, ঠাণ্ডা লাগবে!

শুভ্রা চ্যাটার্জি লাস্ট-মোমেন্ট-ব্যাগ থেকে অন্য মোজা বার করলেন। বুলবুল হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কাকু, তুমি পরিয়ে দাও!

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, না, নিজে পরো। কাকুকে বিরক্ত করবে না। আচ্ছা, এদিকে এসো, আমি পরিয়ে দিচ্ছি।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক, উনি তবু এতক্ষণে মেয়ের দিকে নজর দিয়েছেন। বাচ্চাদের জামা-জুতোটুতো পরানোর কাজ আমার দ্বারা একদম হয় না।

মেয়েকে তৈরি করে দেবার পর শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকালেন। সোজা দৃষ্টি। যেন উনি আমার মনের ভেতরটা দেখে নিতে চাইছেন। আমিও চোখ ফেরালাম না। ছেলেবেলায় অনেক স্ট্যাচু-স্ট্যাচু খেলেছি, এতে আমায় চট করে হারাতে পারবে না কেউ।

একটু পরে উনি মৃদু গলায় বললেন, তোমাকে হঠাৎ ডেকে আনলাম, হয়তো তোমার পহলগাম যাবার ইচ্ছে ছিল না। তুমি আগে যখন একবার পহলগাম দেখেছো, এবার আর বোধহয় যেতে না!

যাক, তাহলে এতক্ষণে কৈফিয়ৎ দেবার কথা মনে পড়েছে। আমি মুচকি হেসে বললাম, হয়তো যেতাম!

—কেন?

—দেখুন, আমি যখন কোথাও বেড়াতে যাই, তখন কোন পরিকল্পনা থাকে না। কোথায় কখন যাব বা কোথায় থাকব, তা আগে থেকে ঠিক করে রাখি না কক্ষনো।

—তবু একবার দেখা জায়গায়—

—পহলগাম এতই সুন্দর জায়গা যে, বার বার দেখা যায়।

—যাক্। আমার এতক্ষণ একটু খারাপ লাগছিল, আমি ভাবছিলাম, শুধু শুধু স্বার্থপরের মতন তোমাকে ডেকে আনা হলো—

—বাসের রাস্তা যদি না খুলে থাকে, ট্যাক্সিতে যেতে হবে।

—ট্যাক্সিতেই যাব।

—পহলগাম যাওয়া কি এতই জরুরি?

—খুবই জরুরি। একটা দিনও নষ্ট করা যায় না। তুমিই কাল ট্যাক্সির বুদ্ধিটা দিলে। আর কেউ বলেনি যে, রাস্তা বন্ধ থাকলেও ট্যাক্সিতে সে পর্যন্ত গিয়ে তারপর পায়ে হেঁটে বা অন্যভাবে পহলগাম পৌঁছোনো যায়।

আমি একটু চুপ করে রইলাম। আশা করছিলাম, পহলগাম যাওয়াটা কেন এত জরুরি সে কথাও উনি বলবেন। কিন্তু বললেন না। বরং জিজ্ঞেস করলেন, আজকের মধ্যেই পৌঁছোনো যাবে তো? মানে, দিনের আলো থাকতে থাকতে—

আমি বললাম, তা যাবে। এমনিতে তো ঘণ্টা তিনেক লাগবার কথা, যদি রাস্তা খারাপ থাকে, ঘোড়া পাওয়া যাবে। কিন্তু আজ তো ফেরা যাবে না। রাত্তিরটা থাকতে হবে পহলগামে।

—থাকব। হয়তো বেশ কয়েকদিনই থাকতে হবে পহলগামে। তুমি ফিরে আসতে পারো, যখন তোমার খুশি—

শিকারা এসে থামল ডাল গেটে। এখানে অনেকগুলো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জির সঙ্গে একটা বড় সুটকেস, একটা বেডিং আর দুটি ব্যাগ। আমার একটা সুটকেস আর একটা ঝোলা। বুলবুলকে আগে পাড়ে নামিয়ে দিয়ে তারপর আমার সুটকেসটা নামালাম। আবার ফিরে এসে দেখি শুভ্রা চ্যাটার্জি নিজেই বড় সুটকেসটা নিয়ে নামবার চেষ্টা করছেন। আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, ওটা আমাকে দিন।

উনি বললেন, না, আমি নিজেই পারব!

—আহা, দিন না আমাকে।

উনি একটু ধমক দেবার ভঙ্গিতে বললেন, বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ বলে তোমাকেই যে সব কাজ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করতে পারি। পহলগামেও আমি একাই যেতে পারতাম। নেহাৎ মেয়েটা সঙ্গে রয়েছে বলে—

আমি ওঁর হাত থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে বললাম, আপনি নিজেই নিজের

ব্যবস্থা করতে পারেন, এ তো খুব ভালো কথা। কিন্তু কোন মেয়ে কোন ভারী জিনিস হাত দিয়ে তুলছে, এই দৃশ্যটা আমার পছন্দ হয় না।

উনি শিকারা থেকে পাড়ে নেমে এসে বললেন, রাস্তায় কত মেয়ে কুলির কাজ করে, কত ভারী জিনিস নিয়ে যায়—তাদের সবাইকে দেখে তুমি বুঝি তাদের বোঝা বইবার জন্য ছুটে যাও?

—না। তা যাই না। তবে তাদের কারুর সঙ্গে এক নৌকোয় চেপে বেড়াতে বেরুলে নিশ্চয়ই তখন তার বোঝা আমিই বইতাম।

—আমাকে কি তোমার পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী চলতে হবে?

আমি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললাম, নিশ্চয়ই। আমি যা পছন্দ করব না, সে রকম কিছুই আপনার করা চলবে না। অন্তত আমার সামনে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, আমি যা পছন্দ করব না, আশা করি এমন কিছু তুমিও করবে না।

কথাটা বলার সময়ে ওঁর মুখে একটুও হাসি ফুটল না।

৫

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি বেশ ফুর্তিবাজ। মাঝে মাঝেই সে স্টিয়ারিং-এর ওপর চাপড় মেরে গান ধরে। বলাই বাহুল্য, চলতি হিন্দী সিনেমার গান। ভারত তো এখন হিন্দী সিনেমারই সাম্রাজ্য। লোকটির ছোটোখাটো ঝকঝকে চেহারা, একটা গাঢ় নীল টেরিলিনের জামা পরেছে, গলায় একটা সোনার হার। হঠাৎ হঠাৎ সে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বলে, সাব একঠো সিগ্রেট! এর মধ্যে আমার এক প্যাকেট প্রায় শেষ করে এনেছে। সিগারেট চাওয়ার ব্যাপারে লোকটা নির্লজ্জ একেবারে।

হঠাৎ এক জায়গায় ঘ্যাঁচ করে ট্যাক্সি থামিয়ে সে বলল, আ গিয়া, আওয়ান্তিপুর। আব দেখিয়ে!

শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, একি, এখানে থামল কেন?

আমি বললাম, জায়গাটার নাম অবন্তীপুর। এখানে অনেক পুরোনো কালের একটা হিন্দু মন্দির আছে। অনেকে দেখতে যায়।

শুভ্রা চ্যাটার্জি কপাল কুঁচকে বললেন, আমাদের এসব দেখবার সময় নেই। ওকে যেতে বলো।

ট্যাক্সি ড্রাইভার সেই কথা শুনে আকাশ থেকে পড়ল যেন। মহা বিস্ময়ের

সঙ্গে বলল, কেয়া? নেহি দেখ্না? ইয়ে আপলোগকা হিন্দু মন্দির হ্যায়। বহুৎ পুরানা—

—না, আমরা মন্দির দেখব না, চলো!

—ইয়ে আপলোগকা আর ডি ব্যানার্জি এক্সক্যাভেট কিয়া!

ট্যাক্সি ড্রাইভারের মুখে আর ডি ব্যানার্জির নাম শুনে বেশ মজা লাগল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম কজন বাঙালি আর এখন মনে রেখেছে, কিন্তু কাশ্মীরের লোকরা আজও তাঁর নাম উচ্চারণ করে।

বুলবুল বলল, আমি মন্দির দেখব। ও কাকু, আমি মন্দিরে যাব!

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, ঠিক আছে ও যাক। বুলবুল, যাও দেখে এসো—একদম দেরি করবে না।

আগের বার আমি এই মন্দিরে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়েছিলাম। সামনের প্রবেশ স্তম্ভ ছাড়া আর বিশেষ কিছু অক্ষত নেই। ভেতরে বড় বড় পাথর এদিক সেদিক ছড়ান। বুলবুল একা গেলে আছাড় খেয়ে পড়তে পারে। তাই আমি ওর সঙ্গে গেলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি গাড়িতেই বসে রইলেন।

বুলবুলের হাত ধরে ফিরে এসে আমি তাঁকে বললাম, আপনিও মন্দিরটা একবার দেখে এলে পারতেন। কিছু কিছু চমৎকার প্যানেলের কাজ আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছু কিছু মোটিফ কোনারকের মতন।

শুভ্রা চ্যাটার্জি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, আমি এবার কাশ্মীরে জায়গা দেখতে আসিনি। এসেছি অন্য দরকারে। পরে এসব দেখা যাবে। এখন চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কাছেই কয়েকটা লোক বসে চেরী আর স্ট্রবেরি বিক্রি করছে। বুলবুলের চোখ সেই দিকে। স্ট্রবেরিগুলো ঠিক পাকেনি, এক ঠোঙা চেরী কিনে নিলাম। পকেট থেকে টাকা বার করতে যাচ্ছি, শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, দাঁড়াও আমি দিচ্ছি।

আমি তাঁকে নিবৃত্ত করে বললাম, বেশি নয়, এক টাকা মাত্র। এক টাকার চেরীই খেয়ে শেষ করা যাবে না।

বুলবুল আবার আমার কোলে বসেছে। এ মেয়েটা কিছুতেই নিজে আলাদা বসবে না। মাঝে মাঝে এমনভাবে আমার গলা জড়িয়ে ধরছে, যেন আমার কতকালের চেনা! মেয়েরাই এরকম পারে। মেয়েটার নরম তুলতুলে গা, মাথার চুলগুলো সিল্কের মতন, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমন ছটফটে যে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসবে না।

আবার খানিক দূর গিয়ে ট্যাক্সি থেমে পড়ল। ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, অনন্তনাগমে তো যায়েগা?

শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি?

আমি বললাম, খানিকটা দূরে অনন্তনাগের মন্দির আছে। সেখানে যেতে হলে দু-তিন মাইল বেঁকতে হবে। সেখানে অনেকে পুজো-টুজো দেয়।

—না। যাবার দরকার নেই। আমি পুজো-টুজো দিই না!

বাঙালি নারী মন্দিরের কাছে এসেও পুজো দেয় না, এরকম তো সহসা দেখা যায় না।

—তোমার পুজো দেবার শখ থাকলে তুমি অবশ্য যেতে পারো।

—আমি তো অন্ত্যজ, আমার আবার পুজো কি!

—তা হলে চলো, দেরি করবার দরকার নেই!

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট নিয়ে বলল, সাব, বাঈকো লে যাইয়ে! সব হিন্দু জেনানা ইধার পুজা দেতা হায়।

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমাকে বললেন, ওকে বলে দাও, আমি হিন্দু নই, আমি খৃষ্টান।

আমি হেসে বললাম, সিসটার নিবেদিতা নামে এক খৃষ্টান মহিলাও এখানে পুজো দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আপনার সিঁথিতে সিঁদুর।

উনি এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, কী আশ্চর্য, টাকা দিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া করেছি, তবু কি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথা অনুযায়ী আমাকে চলতে হবে? আমি যদি মন্দির দেখতে না চাই—

আমি তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, ওদিকে বেঁকবার দরকাব নেই, গাড়ি চালাও, সোজা—

তবু ভালো, এবার বুলবুল মন্দির দেখবার আব্দার ধরেনি। সে একমনে চেরী খেয়ে যাচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করবার পর শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, কী রকম মন্দির, সাঙ্ঘাতিক কিছু দেখবার মতন?

আমি বললাম, তা অবশ্য নয়। এখানে লোকে পুণ্যের লোভেই যায়। মন্দিরটা এমন কিছু না। ভেতরে ঝর্না আছে, মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। মনে আছে, ওখানকার ঝর্নার জলে গন্ধকের গন্ধ পেয়েছিলাম।

উনি একটু আগেকার রাগের ভঙ্গি মুছে ফেলে বললেন, আমি এমনিতে মন্দির-টন্দির সব ঘুরে ঘুরে দেখতে ভালোই বাসি। কিন্তু এখন আমার মন ওসব দিকে নেই।

বুলবুল কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তার হাতে তখনো চেরী ফলের ঠোঙা।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, ও ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি, ওকে মাঝখানে শুইয়ে দাও না!

উনি মেয়েকে টেনে নিয়ে তার মাথাটা নিজের কোলে রেখে পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন আমাদের মাঝখানে। তারপর বললেন, বাবাঃ বাঁচলাম। যতক্ষণ জেগে থাকবে, ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

আমি বললাম, কেন, ও তো কোন জ্বালাতন করে না!

—কিন্তু ওর সামনে সব কথা বলা যায় না। তোমাকে অনেক কিছুই বলা হয়নি।

আমি প্রতীক্ষা করে রইলাম।

—তুমি কমলেশ চ্যাটার্জির কথা শুনেছ?

—সকলের মাসতুতো বা পিসতুতো ভাইদের কি আমার পক্ষে চেনা সম্ভব?

—উনি আমার স্বামী।

আমি একটু থমকে গেলাম। উনি প্রথমেই ওঁর স্বামীর কথা শুরু করবেন, এটা যেন ঠিক আশা করিনি।

—তুমি কমলেশ চ্যাটার্জির ব্যাপারে কিছু শোনোনি?

—না।

—আজ থেকে ঠিক তেইশ দিন আগে উনি পহলগাম থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। একটা ডেলিগেশানে এসেছিলেন, আর সবাই ফিরে গেছে আমার স্বামী ছাড়া। কাশ্মীর সরকারের ধারণা, উনি কোন খাদ-টাদে পড়ে মারা গেছেন। ডেড বডি পাওয়া যায়নি!

আমি শুভ্রা চ্যাটার্জির কপালের সিঁদুরের টিপ ও সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের রেখা একবার দেখে নিলাম। বোঝাই যায়, স্বামীর মৃত্যু উনি স্বীকার করেননি।

না, কমলেশ চ্যাটার্জির এ খবর আমার কানে আসেনি। আমি এখানে এসেছি প্রায় দিন দশেক, ঘটনাটা ঘটেছে তার অনেক আগে। তাও বাঙালি হোটেলে থাকলে কিংবা বাঙালি ভ্রমণকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে হয়তো এর গুঞ্জন এখনো কিছুটা শোনা যেত—কিন্তু আমি ছিলাম সাহেব পাড়ায়, সেখানে এসব কথা কেউ তোলেনি।

আমি ভেতরে ভেতরে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। মৃত্যু বা দুর্ঘটনার খবর শুনলেই আমার বুক কাঁপে। মৃত্যুর মতন একটি অসহ্য গোঁয়ারকে আমি এড়িয়ে চলতে চাই। জীবনে একবারই তার সঙ্গে দেখা হবে, তখন যা হোক দেখা যাবে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, খবর পেয়েই আমার ভাসুর আর শ্বশুরশুর এখানে এসেছিলেন। আমার শ্বশুরশুর পুলিসের ডি আই জি—তাঁরাই দেখেশুনে ঠিক করেছেন যে, ও মরেই গেছে। একটা লোক এমনি এমনি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু তাঁরাও ওর ডেড বডির কোনো হদিশ করতে পারেননি।

—তাই আপনি নিজে একবার দেখতে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আপনি একা, এত বড় জায়গায় কোথায় খুঁজবেন?

মাইলের পর মাইল বিশাল পাহাড়, সম্পূর্ণ নির্জন। অনেক দূরে দূরে সামান্য জনবসতি। এর মধ্যে কোন গিরিকন্দরে যদি দুর্ঘটনায় মরে পড়ে থাকে, কে তাকে খুঁজে পাবে? তা ছাড়া এখানে কিছু হিংস্র জানোয়ার, ছোটো ছোটো আকারের বাঘও আছে শুনেছি। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

—তা বলে আমি চেষ্টা করব না? লোকের কথা শুনেই মেনে নেবো?

—কী হয়েছিল ব্যাপারটা? উনি একা ছিলেন সে সময়?

—ও বিহার গভর্নমেন্টের ইরিগেশন প্রজেক্টের কর্তা ছিল। একটা অল ইণ্ডিয়া কনভেনশানে এসেছিল শ্রীনগরে। সবসুদ্ধ আঠারোজন। মিটিংফিটিং হয়ে যাবার পর সবাই মিলে দু' দিনের জন্য এসেছিল পহলগাম বেড়াতে। প্রথম দিন সবাই এক সঙ্গেই ছিল, এক হোটেলে। পরদিন বেলা এগারোটা আন্দাজ ও কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে যায়। তারপর ওকে আর কেউ দেখেনি। ওর খোঁজ পড়ে সন্ধেবেলা। কোথাও পাওয়া যায়নি। তখন বেশি খোঁজ করাও সম্ভব হয়নি, অনেকে ভেবেছিল, হয়তো অন্য কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছে। পরদিন সকালে সার্চ পার্টি বেরিয়েছিল। তারপর ওরা অনেক রকম নাকি চেষ্টা করেছে।

—উনি তো জঙ্গলের দিকে একা একা গিয়ে হারিয়ে-টারিয়েও যেতে পারেন।

—পুলিসের মত হচ্ছে, বছর দুয়েক আগেও এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল—একজন লোক একা একা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে মারা যায়। তার বডিও পাওয়া যায়নি। পাইনগাছের পাতাগুলো খসে খসে পড়ে পাহাড়ের ওপর গদির মতন হয়ে থাকে। পাইনের পাতা তো সহজে পচে না। তাই অনেক দিন ধরে জমে জমে বেশ মোটা গদি হয়ে যায়, তাই যে-সব লোকের পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা নেই, তারা এখানকার পাহাড়ে এসে ভাবে ওপরে ওঠা বেশ সহজ। গদির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় গর্ত আছে, কোথায় পাহাড় হঠাৎ ঢালু হয়ে গেছে, তা ঐ পাইন পাতার গদির জন্যই বোঝা যায় না। হঠাৎ পা পিছলে কোন খাদে পড়ে গেছে, কেউ আর কোনদিন তার চিহ্নও খুঁজে পাবে না। ওপরটা তো পাইন পাতা দিয়ে ঢাকা থাকবেই!

—এ সব কথা আপনি কী করে জানলেন?

—কাশ্মীর গভর্নমেন্ট আমাকে লিখে জানিয়েছে।

—মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কোন বৈজ্ঞানিকের নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা

কাগজে পড়ি। এটাও সে রকম কোন ব্যাপার নয় তো? লোকে বলে সেসবের পেছনে বিদেশী শক্তির হাত আছে। এখানে এত সাহেব—

—আমার স্বামী একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাকে ঠিক বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। বিহারের সেচ ব্যবস্থা নিয়ে কোন বিদেশী শক্তির আগ্রহ থাকার কথা নয়।

—তা হলে এটা যদি দুর্ঘটনা হয়, তা হলে আপনি একা, মানে আমরা কি সেটা খুঁজে বার করতে পারব?

—যদি দুর্ঘটনা হয়, তা হলে আমাদের আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আমি আর একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই। ও ছাত্র বয়েসে একবার মাস ছয়েকের জন্য বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। লছমোনঝোলায় সাধুদের সঙ্গে নাকি ছিল তখন। আমাদের বিয়ের পরেও দু'একবার বলেছে, চাকরি বাকরি ছেড়ে ওর কোথাও একা থাকতে ইচ্ছে করে। চাকরির ব্যাপারে কখনো কোন গণ্ডগোল হলেই ও এই রকম কথা বলত। সেই রকম কিছু যদি করে থাকে?

—এরকম সব কিছু ছেড়ে একা থাকার ইচ্ছে তো অনেক মানুষেরই হয়। কিন্তু সত্যি সত্যি পারে ক'জন?

—যদি হঠাৎ ওর সেই ইচ্ছেটা তীব্র হয়ে থাকে?

—হঠাৎ পহলগামে এসেই বা কারুর সাধু হবার ইচ্ছে হবে কেন? এটা তো কোন তীর্থস্থান বা সে রকম কিছু নয়—

—ঠিক কোন্ মুহূর্তে মানুষ আত্মহত্যা করতে চায় বা পাগল হয়ে যায়, তা কি কেউ বলতে পারে?

—কিন্তু আমার ধারণা, কোন চীফ ইঞ্জিনিয়ার এরকমভাবে সাধু হয় না। যারা অনেক রকম দায়িত্ব নিতে অভ্যস্ত, তারা সহজে দায়িত্ব কাটাতে পারে না।

—তোমাকে একটা চিঠি দেখাচ্ছি। এই চিঠিটা আমার কাছে এসে পৌঁছেচে, ওর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছোবার সঙ্গে, একই দিনে। চিঠিটা তুমি পড়বে?

শুভ্রা চ্যাটার্জি হাতব্যাগ খুলে চিঠিটা খুঁজতে লাগলেন। বুলবুল শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। ট্যাক্সিটা সমতল ছেড়ে পাহাড়ে উঠছে। রাস্তার পাশ দিয়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এক দুর্দান্ত খরস্রোতা নদী। চিনি এই নদীটাকে। এর নাম লিদ্দার। শুধু পাহাড় কেন, এই নদীটাতেই যদি কেউ একবার পা পিছলে পড়ে যায়, বড় বড় পাথরের চাঙ্গারে ধাক্কা খেয়ে দু'এক মিনিটের মধ্যে মারা যাবে। তার মৃতদেহের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি চিঠিটা খুঁজে পেয়েছেন। একটা পিকচার পোস্টকার্ড। সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পড়ো!

স্ত্রীকে লেখা কোন স্বামীর চিঠি, সেই স্ত্রীরই সামনে বসে পাঠ করা রীতিমতন অস্বস্তিজনক ব্যাপার। তবু আমাকে পড়তে হলো।

শুভ্রা,

এখানে আমার হোটেলের জানলা দিয়েই ছোটোখাটো একটা গ্লেসিয়ার দেখা যায়। ওটার নাম এখনো জানি না। পাহাড়ের ওপর থেকে অনেকখানি বরফ গড়িয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেছে। মাফলার আনতে ভুলে গেছি, একটা মাফলার সঙ্গে থাকলে বেশ ভালো হতো। বেশ শীত। আমার ঘরে শ্রীনিবাসন আছে। ওর ঠাণ্ডা লেগেছে। এখানে দুধ বেশ সস্তা।

ইতি

K. C. Chatterjee

চিঠিটার বৈশিষ্ট্য কিছুই খুঁজে পেলাম না আমি। সাধারণ চাকুরে লোকরা তো এই ধরনের চিঠিই লেখে। প্রথমে খানিকটা কবিত্ব করার চেষ্টা। তারপরই আজেবাজে কথা। বেশির ভাগ লোকই চিঠিতে কী লিখবে, সেরকম কথা খুঁজে পায় না। কোন রকমে জায়গাটা ভরায়। স্ত্রীর কাছে চিঠি, তাও ইংরিজিতে নাম সই! এই সব লোক কক্ষনো সাধু হয় না।

আমি বিনা মন্তব্যে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বুঝলে?

—না।

—এটা অস্বাভাবিক মনে হলো না?

—না তো!

—দ্যাখো, চিঠিতে আমার বা বুলবুলের কোন উল্লেখ নেই। আমরা কেমন আছি সে কথা জানতে চায়নি, নিজে কেমন আছে বা কবে ফিরবে তাও কিছুই জানায়নি।

—পোস্টকার্ড তো, তাই ওসব আর লেখেননি।

—এরকম ভুল স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া কথাগুলো কেমন ছাড়া ছাড়া, কোন মানে নেই। নেহাৎ যেন দায়সারা।

প্রত্যেক চিঠিতেই স্বামীদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভালোবাসা জানান বা তাদের কুশল সংবাদ নেওয়া একটা ডিউটির মধ্যে পড়ে কিনা, সে সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া কমলেশ চ্যাটার্জি মানুষটি কীরকম ছিলেন, তাও আমি জানি না।

বুলবুল মোচড় দিয়ে পাশ ফিরে শুলো। শুভ্রা চ্যাটার্জি তাকে আরো ঘুম পাড়াবার জন্য গায়ে মৃদু চাপড় দিতে লাগলেন। আমাকে বললেন, প্লিজ, এসব কোন কথাই যেন বুলবুল জানতে না পারে। ওকে আমরা এখনো কিছুই বলিনি।

—আপনার বাড়ির লোকেরা আপনাকে এরকম একলা আসতে দিল?

—আমি জোর করে এসেছি! মেয়েটা আমাকে ছেড়ে একলা থাকতে পারে না, তাই ওকে সঙ্গে আনতে হলো।

—আপনি ওকে ছেড়ে থাকতে পারতেন?

শুভ্রা চ্যাটার্জি ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, কখনো থাকিনি, তবু পারতাম বোধহয়। আমার শাশুড়ির কাছে রেখে আসা যেত।

কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর একটা ভিড় জমে আছে। একটু আগে বাতাকুট ছাড়িয়ে এলাম। আমাদের ট্যাক্সিটা দেখে জনতার অনেকে হাত নেড়ে কী সব বলতে লাগল। কাছে আসবার পর বুঝলাম, ওরা বলছে আর যাবে না। ট্যাক্সি আর যাবে না।

আমি আর ট্যাক্সি ড্রাইভার দুজনেই নেমে এগিয়ে গেলাম সরেজমিন তদন্ত করতে। কাছে গিয়ে চক্ষু স্থির! একটা ছোটখাটো পাহাড় ভেঙে পড়ে আছে পথের ওপরে। সমস্ত জিনিসটা একটাই পাথর, ওপর থেকে গড়িয়ে নেমে এসেছে এবং তার তলায় চাপা পড়ে আছে একটা মিলিটারি ট্রাক। লোকের মুখে শুনলাম, ট্রাকটি খালি ছিল এবং এর চালকটি প্রায় দৈব উপায়ে বেঁচে গেছে। এত বড় পাথরটি কী করে সরানো হবে? দেখলে তো মনে হয় পঞ্চাশটা হাতিও এটাকে এক চুল নড়াতে পারবে না। আর একটা উপায় আছে, ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া।

পাথরটিকে মনে হয় জীবন্ত, এর মধ্যে একটা প্রবল বলশালিতার চিহ্ন আছে। যেন এই সব পাথরের মাঝে মাঝে উড়তে ইচ্ছে করে এদিক ওদিক। মৈনাক পর্বত যেমন উড়তে চেয়েছিল। ঐ পাথরটির রূপ আমাকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ করে রাখে। পাথরটি যখন গড়িয়ে নামছিল, তখন নিশ্চয়ই শব্দ হচ্ছিল শত শত বজ্রপাতের। সেই সময় আমি কাছাকাছি থাকলে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে পেতাম!

খবরের কাগজে পড়েছিলাম, একবার এই পহলগামেই হঠাৎ মেঘ ভেঙে পড়েছিল, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লাউড বার্স্ট। তাতে বেশ কিছু লোক মারা গিয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল কয়েকটি বাড়ি। নিশ্চয়ই একটি ভয়াবহ ঘটনা। তবু সেই খবরটা পড়ে আমার আফসোস হয়েছিল, ইস্, কেন সেই সময়টাতে আমি ঐ জায়গায় উপস্থিত ছিলাম না। তাহলে আমিও দেখতে পেতাম অকস্মাৎ আকাশ থেকে মেঘ ভেঙে পড়ার মহাদুর্লভ দৃশ্য! কেমনভাবে মেঘ ভেঙে পড়ে, তা কি

সারা জীবনে আমার দেখা হবে না ? জন্মেছি তো দেখবার জন্যই। মনে হয়, এখনো এ পৃথিবীর কিছুই দেখিনি।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি হাতের তালু উলটে বলল, আউর ক্যা হোগা ? আব লৌট চালিয়ে !

একপাশে খাড়া পাহাড়, আর এক পাশে ঢালু খাদ, এর মধ্য দিয়ে এখন ট্যাক্সি তো দূরের কথা, মানুষ গলাও দুঃসাধ্য। ফিরে এসে শুভ্রা চ্যাটার্জিকে ঘটনাটা জানালাম। উনি স্থিরভাবে শুনলেন। তারপর বুলবুলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বুলবুল ওঠো, এবার আমাদের নামতে হবে !

আমরা ফিরে যাব না শুনে ট্যাক্সি ড্রাইভার অবাক। তারপর সে ফরাসী কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাল। তাকে সাড়ে তিনশো টাকা দিতে হবে, যাওয়া আসা মিলিয়ে।

আমি দরদাম করতে যাচ্ছিলাম, শুভ্রা চ্যাটার্জি হাত তুলে নিষেধ করলেন। তারপর ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন, আমি তোমাকে প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছি, তুমি যখন তখন টাকা দেবার চেষ্টা করবে না। সব টাকা আমি দেব—আমি অনেক বেশি টাকা এনেছি।

আমি একটু ভর্ৎসনার সুরে বললাম, মেয়েদের মুখে টাকা পয়সার কথা শোনা আমি একদম পছন্দ করি না !

শুভ্রা চ্যাটার্জি হেসে ফেলে বললেন, ঠিক আছে, টাকার কথা উচ্চারণ করব না, চুপি চুপি দিয়ে দেব। তুমি আগে থেকে টাকা দিতে যেও না...।

একটু থেমে উনি আবার বললেন, প্লীজ !

আমি বললাম, আমি টাকা দেবার জন্য পেড়াপিড়িও করব না। কারণ তেমন বেশি টাকা নেই আমার।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদের মালপত্তর নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। পথের ওপর সুটকেস নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের ঘিরে ছোটখাটো একটা ভিড়।

৬

ঘোড়া পাওয়া গেল না। সব ঘোড়া পহলগামের ওদিকে। এদিকে কয়েকজন চাষীর কাছে ঘোড়া আছে বটে, কিন্তু সেগুলো শিক্ষিত নয়। হঠাৎ জোরে ছুটতে শুরু করলে আমরা নতুন লোক—মারা পড়ব। আমরা যদি বাত্তাকুটে ফিরে যাই, সেখানকার ফরেস্ট রেস্ট হাউসে থাকবার জায়গা পেতে পারি।

জনতার কয়েকজন আমাদের এই সব খবর জানাল। বাতাকুট ফেলে এসেছি মাইলখানেক আগে। সেখানে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই শুভ্রা চ্যাটার্জির। যেমন করেই হোক পহলগামে পৌঁছোতে হবে। পহলগাম এখান থেকে মাত্র ছ'সাত মাইল দূর—যদিও পাহাড়ী রাস্তা, তবু ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। সমস্যা হচ্ছে মালপত্র নিয়ে। এই সুটকেস-ফুটকেস নিয়ে তো বেশিক্ষণ হাঁটা যাবে না।

আগেই লক্ষ্য করেছি, কুলি কথাটা এখানে চলে না। কুলি শব্দটার মধ্যে কেমন যেন হীনতা আছে। যে-কোন রেল স্টেশনে নেমে লোকে 'কুলি' 'কুলি' বলে চ্যাঁচায়, কিন্তু মালবাহকদের আজকাল পোর্টার বলাই রেওয়াজ। এটা তবু খানিকটা ভদ্রস্থ। খবরের কাগজে রিপোর্টার থাকে আর এরা পোর্টার, খুব বেশি তফাৎ নেই।

সে রকম একজন পোর্টারকে পাওয়া গেল। সে বারো টাকায় সব মালপত্র নিয়ে যেতে রাজি। উপরন্তু সে রাস্তা চেনে। আমাদের পহলগাম পৌঁছোবার এরকম গোঁয়ার্তুমি দেখে ভিড়ের লোকেরা খুব একটা অবাক হলো না। টুরিস্টদের নানারকম পাগলামি এদের গা-সহা।

খানিকটা পিছিয়ে এসে আমরা পাহাড়ের ওপরে ওঠার একটা সরু পথ পেলাম। বুলবুলকে আমি কোলে নিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই কোলে থাকবে না, সে একলা একলা দৌড়ে দৌড়ে যেতে চায়। তাকে জোর করে চেপে ধরে রাখতে হয়েছে। বৃষ্টিতে পাথর পিছল হয়ে আছে, হঠাৎ কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ আমার মনে মনে একটু হাসি পায়। এত দূরের একটা জায়গায় আমি প্রায়-অচেনা এক মহিলার ছোট মেয়ে কোলে নিয়ে সামলাচ্ছি ! জীবনে কক্ষনো আমি এরকম কাজ করিনি। আমাকে অবিকল কোন ছোটমামার মতন দেখাচ্ছে।

একটু পরেই আমরা দেখতে পেলাম রাস্তার ওপর পড়ে থাকা সেই পাথরের চাঁইটাকে। তার নীচে চাপা পড়া মিলিটারি ট্রাকটা যেন ডিঙ্কি টয়। সেখানকার মানুষজন আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। সব পুতুল।

এখানে উপড়ে পড়ে আছে কয়েকটি পাইন গাছ। আশ্চর্য, পাথরটার নেমে যাওয়ার পথের নিশানা নেই। আমি ভেবেছিলাম এখানকার গাছপালা ঘাস সব প্লেন হয়ে মিশে থাকবে মাটিতে, তা তো নেই। পাথরটা কি হঠাৎ লাফ দিয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল ! সাধে কি মনে হয়েছিল এই সব পাথর মাঝে মাঝে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়ায় !

জায়গাটা সাবধানে পার হয়ে একটু বাদেই আমরা আবার নীচের পাকা রাস্তায় নামলাম। পোর্টারটি অবশ্য বলেছিল, ওপরের পাহাড়ী পথ দিয়ে গেলে অনেক শর্টকাট হতে পারে, কিন্তু তাতে রাজি হইনি। এখানে বুলবুলকে কোল থেকে

নামিয়ে দেওয়া যায়। বুলবুলকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইতিমধ্যেই আমি হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি যাতে সেটা না বুঝতে পারেন তাই আমাকে বড় বড় নিশ্বাসও গোপনে ফেলতে হয়েছে।

অবশ্য খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। শীতের জায়গার এই সুবিধে, পরিশ্রম করলেও ক্লান্ত হতে হয় না সহজে। শরীর থেকে ঘাম বেরোয় না, এটা কি একটা কম কথা! আমি শীত ভালোবাসি। আমি বর্ষাও ভালোবাসি। তা হলে কি আমি গ্রীষ্মকে কম ভালোবাসি? তা-ও তো নয়। না, না, কলকাতার দারুণ গরমের দুপুরও আমার খুব পছন্দ।

আকাশে ঝকঝক করছে রোদ, অথচ উত্তাপ নেই। দু'তিন দিন আগে এদিকে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে শুনেছি, দুর্ঘটনাটিও ঘটেছে তার মধ্যে। দিনের বেলা। এখন সেসবের আর চিহ্নমাত্র নেই। চারপাশে প্রকৃতি আবার শান্ত সুন্দর হয়ে আছে। সামনের পাহাড়শ্রেণী ক্রমশ গভীর, গভীরতর হয়ে উঠছে, যেন এর কোন শেষ নেই। হিমালয়কে বলা যায় দিগন্ত-বিরোধী। হিমালয়ের মধ্যে এলে শুধু হিমালয়কেই দেখতে হবে, আর কিছু না, এমনকি আকাশও না।

অনন্ত নাগ নামটা বার বার ঘোরাফেরা করছে মনের মধ্যে। কথাটা কি আসলে অনন্ত নগ? নগ মানে পাহাড়। তা হলেই ঠিক যেন মানায়। এখানে অনেক নামই তো এরকম বদলেছে। একটা জায়গাকে সবাই বলে মাটন, আসলে জায়গাটার নাম মার্তণ্ড, কারণ ওখানে সূর্যের মন্দির আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞেস করলাম, হাঁটার অভ্যেস আছে তো?

তিনি সংক্ষেপে বললেন, না।

—তাহলে যদি কষ্ট হয় বলবেন, আমরা একটু থেমে বিশ্রাম নিতে পারি।

—কষ্ট হচ্ছে না।

—এক সময় তো লোকে এই পথ দিয়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। এটা অনেকদিনের পুরোনো রাস্তা।

—এই রাস্তা দিয়েই তো পহলগাম হয়ে অমরনাথ যায় সবাই, তাই না?

—শুধু অমরনাথ কেন? শুনেছি যোজিলা পাস পর্যন্ত যাওয়া যায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতাকে নিয়ে এই রাস্তা দিয়েই তো হেঁটে গিয়েছিলেন?

আমি একটু চমকে গেলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্বামী বিবেকানন্দর ভক্ত নাকি?

আমিও হেসে বললাম, আমি খাঁটি আর্য। ভক্তি জিনিসটা আমার মধ্যে নেই।

—কেন, আর্য হলে বুঝি ভক্তি থাকতে নেই?

—না। ভক্তিবাদ এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকে। আর্যরা দুর্গা বা সরস্বতীকে দেবীই বলতেন, মা বলতেন না।

—আমার স্বামী খুব বিবেকানন্দ ভক্ত।

আমি চুপ করে গেলাম। উনি আবার বললেন, তখন কী একটা মন্দিরের কাছে তুমি হঠাৎ সিস্টার নিবেদিতার নাম বললে, তাতে আমিও চমকে উঠে ছিলাম। কমলেশ আমার সঙ্গে থাকলে ঠিক এইরকম কথাই বলত। ওর এই সব জিনিস মুখস্থ।

আমি বললাম, আমি অবশ্য এত সব কিছু জানি না। কী একটা বইতে পড়েছিলাম যে সিস্টার নিবেদিতা এদিকে এসেছিলেন তাই মনে পড়ল আর বলে দিলাম।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, কমলেশের মুখে অনেকবার এই সব গল্প শুনেছি। স্বামী বিবেকানন্দ সিস্টার নিবেদিতাকে অমরনাথের মন্দিরে নিয়ে তাঁকে শিবের কাছে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতাকে কী দীক্ষা দিয়েছিলেন, তুমি জানো? উনি কিন্তু নিবেদিতাকে সন্ন্যাসিনী করেননি, শুধু ব্রহ্মচারিণী করেছিলেন।

আমি বললাম, নিবেদিতা সন্ন্যাসিনী হবেন কী করে? উনি তো পরে অনেক পলিটিকস-টলিটিকস করেছিলেন, বোমা-পিস্তলের ছেলেদের প্রেরণা দিয়েছিলেন শুনেছি।

—স্বামীজী হয়তো সেসব আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তাঁকে সন্ন্যাসিনী করেননি। ব্রহ্মচারিণী করাই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। নিবেদিতার অবশ্য এজন্য দুঃখ ছিল খুব।

—স্বামীজীর সঙ্গে কি নিবেদিতার প্রেম ছিল?

—ছিঃ!

—আপনিও বুঝি একজন মরালিস্ট? যাঁকে ভক্তি করা হয়, তাঁর প্রেমের কথা উচ্চারণ করতে নেই!

—ধুৎ বোকা! প্রেম থাকলে কী আর কেউ তার প্রেমিকাকে ব্রহ্মচারিণী হতে বলে?

—এ অন্য ধরনের প্রেম। দান্তের সঙ্গে বেয়াত্রিচের যেমন ছিল, তারাও তো কেউ কারুর অঙ্গ স্পর্শ করেনি কোনদিন।

—এই সম্পর্কটার নাম প্রেম না হয়ে অন্য কিছু হলেই ভালো হয়। বাংলা ভাষায় শব্দ এত কম! নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দকে পিতা কিংবা রাজা বলে সম্বোধন করতেন।

—যাক গে! স্বামী বিবেকানন্দর প্রসঙ্গটা কেন এল?

—কমলেশ ওঁর ভক্ত, সেই জন্য হঠাৎ মনে এল। আমার মনে হয়, কমলেশও অমরনাথ যাবার চেষ্টা করেছিল।

—অসম্ভব! এ সময় অমরনাথ যাবার রাস্তা খোলা থাকে না। রাস্তা খুলবে জুলাইয়ের শেষ দিকে বা আগস্টে। এখন তো সবে মে মাস শুরু হয়েছে।

—রাস্তা খোলা না থাকলেও কেউ চুপি চুপি চলে যেতে পারে না? কারুকে ঘুষ-টুস দিয়ে!

আমি এবার হেসে উঠলাম। রাস্তা খোলা থাকে না বলতে উনি বুঝেছেন রাস্তার মাঝখানে কোন গেট তালা বন্ধ আছে। কেউ চুপি চুপি সেই গেট টপকে পালাবে।

হাসতে হাসতেই বললাম, রাস্তা খোলা থাকে না মানে যাওয়াই যায় না। সমস্ত রাস্তা বরফে বুজে গেছে। কেউ যেতেই পারবে না।

—তবু যদি কেউ যাবার চেষ্টা করে? এত দূর এসেও কি কমলেশ স্বামীজীর স্মৃতিজড়ানো একটা তীর্থস্থান না দেখে ছাড়বে?

—সেরকম ইচ্ছে থাকলেও সেখানে যাবার এখন কোন উপায় নেই। সব তীর্থস্থানে যাবারই তো একটা বিশেষ সময় আছে। অমরনাথের বিখ্যাত যে বরফের শিবলিঙ্গ সেটাও তো এখন দেখা যাবে না। এখন সবই বরফ! জুলাই মাস থেকে বরফ গলে যায় চারদিকে, তখন একটা গুহার ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, গুহার ভেতরে সেই জলই জমে বরফ হয়ে একটা শিবলিঙ্গের মতন হয়—লোকে সেটাকেই অপ্রাকৃত ব্যাপার বলে পুজো করে। আপনার স্বামী এপ্রিল মাসে সেখানে যাবার চেষ্টা করবেন কেন? তিনি নিশ্চয়ই নির্বোধ ছিলেন না?

—ছিলেন? তুমিও অতীতকাল দিয়ে কথা বলছ? অর্থাৎ তুমিও ধরে নিয়েছ সে বেঁচে নেই?

আমি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম। সত্যি কথাটা তাই, আমি সেই রকমই ধরে নিয়েছি। একটা মানুষ এমনি এমনি হারিয়ে যায় না সহসা। বরং মৃত্যুই অনেককে হঠাৎ হঠাৎ টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু এই মহিলাকে সে কথা জানাবার দায়িত্ব আমার নয়!

একটু তো তো করে বললাম, না, মানে, ওটা হঠাৎ মুখে এসে গেছে, সে কথা আমি বলতে চাইনি। তবে, যা বলছিলাম, এই সময় কেউ অমরনাথ যায় না, আমি যদ্দূর জানি। একা যাবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেউ তবু জোর করে যাবার চেষ্টা করেছে কিনা তা একটু চেষ্টা করলেই জানা যায়। সরকার থেকে নিশ্চয়ই সে চেষ্টা করা হয়েছে।

—তবু আমি একবার খোঁজ নিতে চাই।

—নিশ্চয়ই, আমরা ওখানে গিয়ে খবর নেবো।

বুলবুল খানিকটা দৌড়োদৌড়ি করেই ক্লান্ত। এক সময় সে আমার কোলে থাকতে চাইছিল না, এখন মাঝে মাঝেই এসে বলছে, একটু কোলে নাও, ও কাকু, একটু কোলে নাও।

শুভ্রা চ্যাটার্জি নিজেই কিছুক্ষণ মেয়েকে কোলে নিয়ে হাঁটলেন। আমি লক্ষ্য করলুম, উনিও খুব গোপনে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছেন। অর্থাৎ উনিও জানাতে চান না আমাকে ওঁর ক্লান্তির কথা।

রাস্তার ধারে ধারে হোটেলের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং দেখা দিতে শুরু করেছে। তার মানে আর বেশি দূর নেই। এর মধ্যে একবার মাত্র আমরা বিশ্রাম নিতে বসেছি। পোর্টার ছেলেটির কিন্তু একটুও ক্লান্তি নেই। মাথায় দুটি সুটকেস আর হাতে একটা ঝুড়ি ঝুলিয়ে সে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে।

পহলগামে এসে রীতিমতন হকচকিয়ে গেলাম। আগের বার এসে দেখেছিলাম একটা চুপচাপ শুনশান ছোট জায়গা। রাস্তার পাশে কয়েকটি দোকান আর দু চারটি হোটেল। এবং দুপা বাড়ালেই চারপাশ থেকে পাহাড় ঘিরে ধরে।

এখন একেবারে জমজমাট ব্যাপার। বড় বড় হোটেল, টুরিস্ট দপ্তরের শাখা, ব্যাঙ্ক আর বহুরকমের দোকানপাট। পেল্লায় পেল্লায় হোটেল। এক একটা হোটেলে এমনকি চীনে খাবার এবং নাচের ফ্লোর পর্যন্ত আছে। সব কিছু তো বদলাবেই। এমনকি পহলগাম শহরটিরও বড় হবার অধিকার আছে।

জায়গাটা মানুষের ভিড়ে গিসগিস করছে। অথচ এর উল্টোটাই ভেবেছিলাম। একটু বাদেই অবশ্য এত ভিড়ের কারণ বুঝতে পারা গেল।

পহলগামে অধিকাংশ ভ্রমণকারীই সকালে এসে বিকেলে ফিরে যায়। সকাল থেকে পঞ্চাশ ষাটটা বাস ভর্তি করে লোক আসে, তারা ঘোড়ার পিঠে চেপে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে বেড়ায়, দুপুরে হোটেলে খেয়ে আবার চারটের সময় ফেরার বাস ধরে। এখানে কয়েকদিন থেকে যেতে আসে শুধু তারাই, যারা নিছক দৃশ্যলোভী নয়, যারা ভালোবাসে পাহাড়ের বিশাল নিস্তব্ধতা।

কিন্তু তিনদিন আগে যে দৈনন্দিন ভ্রমণকারীরা এসেছিল, তারা অনেকেই ফিরতে পারেনি। পথের ওপর দুর্ঘটনা হয়েছে দুপুরবেলা, বিকেলের সব বাস এদিকে আটকে গেছে। তার ফলে প্রচুর অনিচ্ছুক লোক থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে এখানে। হোটেলগুলো সব ভর্তি। আমরা ভুল সময়ে এসে পড়েছি এখানে। অবশ্য শুভ্রা চ্যাটার্জির তো দিনক্ষণ ঠিক করে আসার মতন মনের অবস্থা নয়!

আমাদের দেখে সবাই অবাক। এই তিনদিনের মধ্যে এখান থেকে কয়েকজন

পায়ে হেঁটে ফিরে যাবার চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু নতুন লোক একজনও এদিকে আসেনি। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝখান দিয়ে আমরা নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম।

একটাই সোজা রাস্তা, তার দুদিকে যত হোটেল আর দোকানপাট। আমরা দুপাশের হোটেলে জিজ্ঞেস করতে করতে যাচ্ছি। কোথাও ঘর খালি নেই। অনেক হোটেলেই এক ঘরের মধ্যে সাত আটজন বাধ্য হয়ে গাদাগাদি করে আছে। আমাদের সঙ্গে মালপত্র রয়েছে, এ নিয়ে বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যায় না।

শুভ্রা চ্যাটার্জি একটু নিরাশভাবে বললেন, থাকার জায়গা না পাওয়া গেলে তো খুব মুশকিল হবে। বিশেষ করে বুলবুলের জন্য—

আমি বললাম, একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। হোটেল না পাওয়া গেলে, তাঁবু আছে। তাঁবুতেও চমৎকার থাকা যায়।

বুলবুল জিজ্ঞেস করল, তাঁবু কী?

আমি বললাম, কাপড়ের তৈরি বাড়ি। ছবিতে দেখোনি, সৈন্যরা থাকে?

বুলবুল বলল, আমি তাঁবুতে থাকব। হোটেলে থাকব না, তাঁবুতে থাকব।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, দাঁড়াও। দুষ্টুমি করো না। সেখানে বাথরুম-টাথরুমের অসুবিধে...

শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি বেশ বড় নামকরা হোটেল। সেখানে শেষ চেষ্টা করলাম। ম্যানেজার বললো, হ্যাঁ, পাওয়া যাবে ঘর, দোতলায়, হিল ফেসিং।

আমি বললাম, আমাদের দুটি ঘর চাই। পাশাপাশি হলে ভালো হয়, না হলেও ক্ষতি নেই।

ম্যানেজার অবাক হয়ে বলল, দুটি ঘর? কিন্তু আমাদের তো একটাই ঘর খালি আছে! আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না—ডাবল বেড রুম, আপনাদের বাচ্চার জন্য যদি আলাদা খাট চান।

আমি শুভ্রা চ্যাটার্জির দিকে তাকালাম। এ কথা আমি একটু আগেই ভেবেছি। অনেকেই আমাদের এরকম ভুল করবে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, আমাদের দুটি ঘরই চাই, পাশাপাশি হলে ভালো হয়।

—আর তো নেই। কোথাও এখন ঘর পাবেন না।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, তবে চলো, আগে তাঁবুগুলো দেখে আসি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আমি বললাম, আর একটা কাজ করা যায়। আপনি আর বুলবুল এই হোটেলে থাকুন, আমি অন্য কোথাও একটা জায়গা খুঁজে নেব। আমার একার পক্ষে জায়গা পেতে অসুবিধে হবে না।

—তা হয় না।

—কেন হবে না? ছোট্ট জায়গা, যে-কোন সময়েই তো দেখা হতে পারে।

—তোমার জায়গা ঠিক না হলে আমি এখানে আসব না। তাঁবুতে কি খুব অসুবিধে?

—অনেকের কাছে হোটেলের চেয়ে তাঁবুই বেশি ভালো লাগে।

—কোথায় তাঁবু, আগে গিয়ে দেখি।

—তাঁবু তো আছে দোকানে। নদীর ধারে আমরা যেখানে বলব, সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে দেবে। সেখানে খাট, বিছানা, বালিস, চেয়ার টেবিল এমনকি ড্রেসিং টেবলও পাওয়া যেতে পারে। আলাদা বাথরুম, সার্ভিস প্রিভি—সবচেয়ে ভালো তাঁবু হচ্ছে সুইস কটেজ টাইপ—দেখতে সুন্দর।

—তা হলে আমরা তাঁবুতেই থাকব। সেখানে কাছাকাছি মানুষজন অন্তত থাকবে না। খাওয়া?

—শহরের হোটেলে। কিংবা তাঁবুতেও রান্নার ব্যবস্থা করা যায়। এরা স্টোভ, ডেচকি এমনকি কাপ ডিস পর্যন্ত ভাড়া দেয়।

—তাহলে আর শুধু শুধু হোটেল খুঁজে মরছি কেন এতক্ষণ?

এখানে অনেকগুলো তাঁবু-সরঞ্জামের দোকান। যারা দূরে দূরে মাছ ধরতে যায়—তারা এখান থেকেই তাঁবু ভাড়া নেয়। অমরনাথের যাত্রীদেরও অনেক সময় তাঁবু লাগে। একটা দোকানে এসে আমরা সুইস কটেজ টাইপ তাঁবু আর যা যা জিনিসপত্র লাগবে, হিসেব করে অর্ডার দিলাম। তারপর বেরিয়ে পড়লাম নদীর ধারে জায়গা নির্বাচন করতে।

শহর ছাড়িয়ে এসে লিদ্দার নদীর প্রথম ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আমার একটা কথা মনে পড়ল। আপন মনেই বললাম, আমি একদম বোকা! ঠিক সময়ে আমার কিছু মনে পড়ে না!

শুভ্রা চ্যাটার্জি জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কী হলো?

—তাঁবুরই যখন অর্ডার দিলাম, তখন দুটো তাঁবুর কথা বলা উচিত ছিল। আপনারা দঁড়ান, আমি বলে আসছি।

—কেন, দুটোর কী দরকার আছে? একটাতে জায়গা হবে না?

—জায়গা হবে। কিন্তু হোটেলের এক ঘরে যদি না থাকতে পারি, তাহলে এক তাঁবুতেই বা থাকব কী করে?

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর নিজেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে না হয়। এখন তো একটাতেই উঠি আগে।

—না, না, কোন অসুবিধে তো নেই। আমি অর্ডার দিয়ে আসছি, ওরা এক সঙ্গেই দুটো খাটিয়ে দিয়ে যাবে।

ওদের দাঁড় করিয়ে রেখে আমি দৌড়ে ফিরে গেলাম। তাঁবুর দোকানে তাঁবুর অভাব নেই, আর একটিও পাওয়া যাবে। এখুনি ওদের লোকজন গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

আবার সেই ব্রীজটার কাছে এসে দেখলাম শুভ্রা চ্যাটার্জি নদীর ধারে একটা পাথরের ওপর অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন, আর বুলবুল জলের একেবারে ধারে গিয়ে নুড়ি কুড়োচ্ছে। আমি নেমে গিয়ে বললাম, কী করছেন কি ? মেয়েকে একলা ছেড়ে দিয়েছেন ?

উনি চোখ তুলে বললেন, ঐ তো বুলবুল !'

—ঐ জলের মধ্যে একটু নামলে কী হবে জানেন ? আর খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

—বুলবুল শিগগির উঠে এসো।

—এই তাঁবুতে থাকার এই এক বিপদ। বাচ্চাটাচ্চা থাকলে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

—আমি বাচ্চাদের সব সময় তুতু-পুতু করে রাখা পছন্দ করি না।

—সে খুব ভালো কথা, কিন্তু এই নদী অতি সাঙ্ঘাতিক।

বুলবুলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললাম, কক্ষনো জলে পা দেবে না। তাহলে কিন্তু মারব ভীষণ।

বুলবুল বলল, ইস্। তাহলে আমিও তোমাকে মারব।

নদীর ধারে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা তাঁবু পড়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে একটা সেনা-ছাউনি। কিন্তু রঙীন পোশাক পরা নানা জাতের নারী পুরুষ দেখলেই সে ভ্রম কেটে যায়। অসংখ্য দড়ি ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে হাঁটতে হয়, বুলবুল অনবরত লাফাচ্ছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, আমরা এই ভিড়ের মধ্যে থাকতে চাই না। কোন ফাঁকা জায়গায় যাওয়া যায় না ?

—তা যায়। তবে নদীর এপারেই থাকতে হবে।

—তাই থাকব, তবে খানিকটা দূরে।

হঠাৎ এক তাঁবু থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, আপনারা আজকে এলেন ?

আমরা যে বাঙালি সে সম্পর্কে মহিলা কোন সংশয়ই রাখেননি, সরাসরি এসে প্রশ্ন করেছেন। আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। দু' চারজন বাঙালির সঙ্গে

এই সব জায়গায় দেখা হবেই। এবং তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ধরে নেবে। এর মধ্যে বুলবুল যদি হঠাৎ আমাকে নীলু-কাকু বলে ডেকে বসে, তা হলেই ব্যাপারটা আরো জমবে। অন্যরা এর মধ্যে বেশ একটা রসালো কেচ্ছার সন্ধান পেয়ে যাবে।

অবিবাহিত নারী-পুরুষও নিশ্চয়ই অনেক সময় এই সব জায়গায় স্বামী-স্ত্রী সেজে আনন্দ করতে আসে। সেটা কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিন্তু সঙ্গে একটা বাচ্চা? বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে অবৈধ ফূর্তি করতে আসে কেউ?

শুভ্রা চ্যাটার্জি শুকনোভাবে কয়েকটা কথা বললেন ভদ্রমহিলার সঙ্গে। আমি বুলবুলকে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তবু ভদ্রমহিলা কাছে এসে বুলবুলকে আদর করে গাল টিপে বললেন, বাঃ, ভারী মিষ্টি মেয়েটি! তোমার নাম কী? আমারও একটা ছেলে আছে এই বয়েসী। পিকলু, পিকলু, এদিকে এসো—

অর্থাৎ ভদ্রমহিলা ভাবছেন, তাঁর ছেলের জন্য একটি খেলার সঙ্গী পাওয়া গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা এই কাছাকাছিই থাকুন না, বেশ গল্প করা যাবে। আমাদের তো এখানে কতদিন থাকতে হবে তার ঠিক নেই, কবে যে রাস্তা খুলবে!

আমি যেন খুব একটা গম্ভীর মানুষ, অচেনা মেয়েদের মুখের দিকেও তাকাই না, এই ভাব দেখিয়ে নদীর দিকে চেয়ে রইলাম।

শুভ্রা চ্যাটার্জি এগিয়ে এসে বললেন, আগে সব জায়গাটা একটু ঘুরে দেখে আসি বরং, চলো—

ভদ্রমহিলাকে কাটিয়ে, সব কটা তাঁবু ছাড়িয়ে আমরা বেশ দূরে চলে এলাম। এখানে দুটো পপলার গাছ রয়েছে, তাতেও খানিকটা আড়াল। অন্য কেউ এত দূরে তাঁবু ফেলেনি, তার কারণ শহরে খেতে যাবার জন্য অনেকটা হাঁটতে হবে। এখানে নদীর ধারে অনেকগুলো বড় বড় পাথর ফেলা, তাতে স্রোত কিছুটা ঘুরে গেছে, একটুখানি জলে পা দিলেই টেনে নেবার সম্ভাবনা খুব কম। লিদ্দার নদীতে সব সময় সমুদ্রের মতন শব্দ। আর জল এত ঠাণ্ডা যে মনে হয় যেন ছুরির ধার। শেষনাগ পর্বতের বরফ-গলা এই নদী, দুর্দান্ত এর রূপ।

জায়গাটা আমাদের পছন্দ হয়ে গেল বেশ। পাথরের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু বাদেই সমস্ত মোটঘাট নিয়ে তাঁবুর দোকান থেকে চারজন লোক এসে গেল।

ব্যবস্থা খুব পাকা। এখানে পুরো মেঝেতে পাতা হলো কাঠের পাটাতন, তার ওপর খাট বিছানা। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব কিছু সাজানো হয়ে গেল। কেন আমরা মাত্র আড়াইজন লোক হয়েও দুটো তাঁবু নিচ্ছি, সে ব্যাপারে এদের দারুণ

কৌতূহল। বার বার বলছে, একটা তাঁবুতেই তো খুব ভালো ব্যবস্থা হয়ে যেত, সাব? কেন দুটো তাঁবু নিচ্ছেন?

অর্থাৎ কেন আমরা বোকার মতন বেশি পয়সা খরচ করছি, সেটাও ওরা বুঝতে পারছে না। ওদের বোঝানোও যাবে না।

ওদের একজনকে শহরে পাঠিয়ে দিলাম কিছু খাবার নিয়ে আসবার জন্য। বাকি দুজনেরও কাজ শেষ হয়ে গেছে, একজন শুধু আমার তাঁবুতে বসে পেরেক ঠুকছে। লোকটি খুব শক্তিশালী, কিন্তু মুখটা বোকা ধরনের।

আমি খাটের ওপর বসে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

সে বলল, কিষণ।

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিষণ আবার কী অদ্ভুত নাম, এখানে এসে এ পর্যন্ত তো একজনেরও এরকম নাম শুনিনি।

সে আবার বলল, হ্যাঁ, সাব। কিষণ। আপলোগ যিসকা কৃষণা বলতা হ্যায়!

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, সে বুঝিয়ে দিল, হাম হিন্দু হ্যায়, সাব।

কাশ্মীরে এসে এই প্রথম একজন সাধারণ হিন্দু দেখলাম। মানুষের ধর্ম নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবু নিছক সমাজতাত্ত্বিক কৌতূহলেই জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঐ দোকানে কাজ করো?

সে বলল, না, সাব, আমি নোকর! আমার বাড়ি ছিল গিলগিট।

অর্থাৎ এই লোকটি একজন রিফিউজি। জীবনে যে কত রকম রিফিউজি দেখলাম!

কাশ্মীরের বেশির ভাগ লোকই সিগারেট-প্রিয়। একে একটা সিগারেট দিয়ে বললাম, আচ্ছা কৃষাণ, তুমি একটা খবর দিতে পারো? আমাদের একজন চেনা লোক, কমলেশ চ্যাটার্জি—তিনি এখানে এসেছিলেন কিছুদিন আগে, তারপর আর তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কী হয়েছিল, বলতে পার?

কৃষাণ বলল, হাঁ সাব, শুনেছি, আগের মাসে একজন বাঙ্গালী এখানে মারা গেছে।

—মারা গেছে? কী হয়েছিল তার?

—তা জানি না। সবাই বলে মারা গেছে।

বোঝা গেল, লোকটির কৌতূহলবৃত্তি তেমন তীক্ষ্ণ নয়। মারা গেছে এইটুকুই শুনেছে, আর কিছু জানবার আগ্রহ নেই। এর কাছ থেকে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া যাবে না।

'সাব' ডাক শুনে তাঁবুর বাইরে এলাম। লম্বা কালো আলখাল্লা-পরা একজন

দীর্ঘকায় বৃদ্ধ এসে দাঁড়িয়ে আছে। সৌম্য মুখ, কোন সন্তের মতন চেহারা। এই লোকটিই তাঁবুর দোকানের মালিক। সে প্রসন্ন গলায় বলল, সাব, আপনারা জায়গা খুব ভালো বেছেছেন। লোকে এত দূরে আসতে চায় না—কিন্তু এখানে শুয়ে থাকলে মানুষজনের গলার আওয়াজ শুনতে হবে না, শুধু নদীর শব্দ শুনবেন। রাত্রে শুয়ে শুয়ে নদীর আওয়াজ শোনা যে কী আরামের, মন একেবারে সাদা হয়ে যায়।

লোকটির নাম মোহম্মদ ইউনুস। সে আরো বলল, এখানে কোন রকম অসুবিধে হলে আমি যেন তাকে জানাই। আমাদের ভালো লাগাটাই বড় কথা। টাকা পয়সা তো এই আছে, এই নেই।

প্রত্যেক তাঁবুতেই একটা ছোট টেবল আর দুটো চেয়ার দেওয়া হয়েছে। আমি একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, ইউনুস সাহেব, বসুন। একটু গল্প করা যাক।

একথা সেকথার পর আমি কমলেশ চ্যাটার্জির প্রসঙ্গটা তুললাম। সে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ ভঙ্গিতে চুপ করে থেকে তারপর বলল, সাব, কত মানুষই তো বিছানায় শুয়ে মরে। এর মধ্যে কেউ যদি পাহাড়ের কোলে গিয়ে মরে, সে তো কত বড় সৌভাগ্য!

—কিন্তু ঐ লোকটি যে মারাই গেছে, তার কোন প্রমাণ আছে? মৃতদেহটা তো কেউ দেখেনি!

—প্রতি বছরই একজন দু'জন লোককে পাহাড় ডেকে নেয়। পাহাড় তাদের দেহকে ফুল-লতা-পাতা দিয়ে সুন্দর করে ঢেকে রাখে। আর কেউ তাদের দেখতে পায় না। আমার যদি শক্ত কোন অসুখ হয়, আমিও বিছানায় শুয়ে মরব না। পাহাড়ের মধ্যে হারিয়ে যাব।

লোকটি অতি সরল হিন্দীতে কথা বলছিল, বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। তাঁবুর দোকান খুলে বসলেও এ আসলে একজন দার্শনিক।

আমার প্রথম দুটি অনুসন্ধান থেকেই পাওয়া গেল শূন্য ফল। কমলেশ চ্যাটার্জির খোঁজখবর আর কী ভাবে নেওয়া যায়, বুঝতে পারলাম না। এখানকার লোকজনের কাছ থেকে যদি কিছু সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করার কোন মানেই হয় না। যোজন যোজনব্যাপী বিশাল গিরিমালা —এর মধ্যে যদি কেউ হারিয়ে যায়, আর কোন মানুষের চোখ হয়তো সত্যিই তাকে কোনদিন দেখবে না।

বুলবুল এসে আমাকে পাশের তাঁবুতে ডেকে নিয়ে গেল। এই তাঁবুটা অনেক বড়, এর পেছন দিকে স্নানের জায়গা পর্যন্ত আছে।

খাবার এসে গেছে, শুভ্রা চ্যাটার্জি সেগুলো তিনটে প্লেটে ভাগ করে দিয়ে

বললেন, বসে পড়ো। কিন্তু খাবার জল? আমার সঙ্গে ফ্লাস্কে একটুখানি আছে—

—এই নদীর জলই খেতে হবে?

—না ফুটিয়ে? কত রকম নোংরা থাকে—

—যে নদীতে এত স্রোত, তাতে কোন নোংরা থাকে না। আর এই জল আসছে পাহাড়ের ওপরের বরফ থেকে, তার চেয়ে পরিষ্কার আর কী হতে পারে?

তাঁবুওয়ালারা দুটো বড় বালতি দিয়ে গেছে। সে দুটো নিয়ে গিয়ে আমি নদী থেকে জল তুলে নিয়ে এলাম। তারপর খাওয়া। রুটি আর মাংস, চমৎকার স্বাদ। বুলবুল ঝালের চোটে উঃ আঃ করতে লাগল। ওর মা কয়েকটা টফি বার করে দিলেন ওকে।

খাওয়া শেষ করে আমি বললাম, আপনারা এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। বিকেলে বেরুনো যাবে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, আমি এক্ষুনি বেরুব। একবার সব জায়গায় খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

—এক্ষুনি যেতে হবে? বিকেলে গেলে হতো না? এখন একটু ঘুমিয়ে নিন বরং।

—আমি কি এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার জন্য এসেছি? তা কি আমার পক্ষে সম্ভব?

—কিন্তু বুলবুল, ও বেচারা এখন হেঁটে হেঁটে আবার অতটা দূর যাবে?

—না, বুলবুল থাকবে। আমি একাই যাব।

—আর আমি এখানে বসে বসে বুলবুলকে পাহারা দেব?

—পাহারা দিতে হবে না, ও এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে। তুমি ততক্ষণ যদি এই তাঁবুতে থাক—

বলতে বলতে উনি থেমে গেলেন। তারপর আবার ইংরিজিতে বললেন, বুলবুলকে তো সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না ওর সামনে সব কথা বলা যাবে না। আমি জানি, আমি স্বার্থপরের মতন ব্যবহার করছি তোমার সঙ্গে, তোমাকে বাচ্চা সামলাবার কাজ দিচ্ছি—

এর উত্তরে কী বলা উচিত? বলা উচিত, হ্যাঁ সত্যিই আপনি আমার সঙ্গে স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করছেন? আপনি আমাকে এখানে শুধু শুধু টেনে এনেছেন? চাকরের কাজ করাবার জন্য?

আমি বললাম, আপনি ঘুরে আসুন। এসব কথা পরে হবে। চিনতে পারবেন তো? রাস্তা তো সোজা একটাই।

খোলা চুলে কয়েকবার চিরুনি চালিয়ে, মাঝখানে একটা রবার ব্যাণ্ড বেঁধে উনি চটপট তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর বুলবুলের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললেন, মামণি, তুমি কাকুর সঙ্গে থাক আমি আসছি একটু বাদেই—

শুভ্রা চ্যাটার্জি যাবার পর আমি তাঁবুর দরজায় দড়ি বেঁধে বন্ধ করে দিলাম ভেতর থেকে। যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি, বুলবুল যাতে বেরিয়ে না পড়তে পারে। তারপর বুলবুলকে পাশে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বুলবুল প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাকু, আমার বাপী কোথায়?

আমি শিউরে উঠলাম একেবারে। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমাকে সবচেয়ে শক্ত একটা কাজ দিয়ে গেছেন। একটা শিশুর কাছে কী করে মিথ্যে কথা বলব আমি? জীবনে সব সময় সত্যি কথা বলেছি, এমন অহংকার আমার নেই। বেঁচে থাকতে গেলে দু'-চারটে মিথ্যে, অন্তত অনেক সময় সত্যকেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অন্যরকমভাবে বলতেই হয়। কিন্তু একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে মিথ্যে বলতে আমার দারুণ কষ্ট হয়।

বুলবুল আবার ঐ একই কথা জিজ্ঞেস করল। উত্তর না শুনে ও ছাড়বে না।

আমি বললাম, তোমার বাপী তো অফিসের কাজে এক জায়গায় গেছেন।

—না, বাপী তো অফিসের কাজে কাশ্মীরেই গিয়েছিল। মা-ও বলেছিল আমরা কাশ্মীরে যাব। কিন্তু আমরা কাশ্মীরে না গিয়ে পহালগামে এলাম কেন?

—এটাও তো কাশ্মীর। পহলগামও কাশ্মীর। তুমি তো কাশ্মীরেই এসেছ।

—তা হলে বাপীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—তাই তো, তোমার বাপী যে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। সেই জন্য আমরা তোমার বাপীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হয়তো তোমার বাপী এর মধ্যে বাড়িতে চলে গেছেন।

—তুমি আমার বাপীকে চেন?

—উঁ ইয়ে হ্যাঁ চিনি!

—তবে তুমি আমাদের বাড়িতে কখনো আসনি কেন?

শীতের মধ্যেও আমি প্রায় ঘেমে উঠছিলাম এত মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে। আমরা ভাবি, বাচ্চারা কিছুই বোঝে না, তাদের যা খুশি বলে ভোলানো যায়। কিন্তু ওদের একটা আলাদা অনুভূতির জগৎ আছে, সেখানে ওরা সব কিছু নিজেদের মতন করে বুঝে নেয়।

আমি বললাম, এবার ঘুমিয়ে পড়ো তো, বুলবুল! না হলে মা এসে রাগ করবেন!

—না, আমি ঘুমোব না!

—কেন, ঘুমোবে না কেন?

—বাঃ, আমি যে গাড়িতে ঘুমোলাম। আবার এখন ঘুমোব কেন?

—তা হলে তুমি এখন কী করতে চাও?

—গল্প শুনব, তুমি গল্প বলো!

—এই রে, আমি যে একটাও গল্প জানি না!

বুলবুল তড়াক করে আমার পিঠের ওপর চড়ে বসে বলল, শিগগির গল্প বলো, নইলে আমি তোমাকে মারব!

—মার!

ও অমনি চটাস্ চটাস করে মারতে লাগল আমার ঘাড়ে। কে বলে বাচ্চাদের গায়ে জোর নেই! মার খেয়ে আমার ঘাড়টা রীতিমতন জ্বালা করছে।

—আর মেরো না, আর মেরো না, আমি গল্প বলছি।

—বলো!

—শোনো, একটা ছেলের নাম ছিল গুপী, আর একটা ছেলের নাম বাঘা, তারা একদিন বনের মধ্যে—

—ওটা আমি জানি!

—জানো! আচ্ছা তা হলে আর একটা...একটা লোক ছিল, তার নাম সিন্ধবাদ, সে একবার জাহাজে করে—

—ওটাও আমি জানি! সেই বড় বড় পাখি, তাদের অ্যাত বড় বড় ডিম...সেটা তো!

—তুমি তো অনেক গল্পই জানো দেখছি! এত গল্প তোমায় কে বলে?

—দিম্মা!

—তা হলে তুমিই আমাকে একটা গল্প শোনাও না!

—না। তুমি গল্প বলো!

—এই রে, আর যে কোন গল্প আমার মনে আসছে না!

বুলবুল না গল্পো বলো বলে নাকি কান্না জুড়ে দিল। তাকে থামাবার জন্য আমি বানিয়ে বানিয়ে দু' একটা গল্প বলবার চেষ্টা করলাম, কোনটাই তার পছন্দ হয় না। বাচ্চাদের গল্প বলার অভ্যেসই নেই আমার কোনকালে। বয়স্ক পাঠকদের তবু খুশি করা সোজা। কিন্তু এই খুদে শ্রোতাটিকে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারি না।

বুলবুল তখনও আমার পিঠের ওপর বসে আছে। এক সময় সে কান্না থামিয়ে বললে, আচ্ছা, তুমি তা হলে ঘোড়া হও?

—এই তো ঘোড়া হয়েছি!

—না, তুমি নীচে নেমে ঘোড়া হও!

—লক্ষ্মীটি, আমি একদম ঘোড়া হতে জানি না। তোমাকে কাল সকালে সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়াব!

—না, তুমি ঘোড়া হও! আমি তোমার পিঠে চাপব!

ওরে বাবারে, অতি বিচ্ছু মেয়ে! ইচ্ছে করছে দারুণ একটা চিমটি কাটি। কিন্তু তারপর যদি ও ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দেয়, তা হলে আর একটা বিপদ হবে।

অগত্যা মাটিতে নেমে উপুড় হয়ে ঘোড়া সাজতে হলো। বুলবুল আমার পিঠের ওপর চেপে কাঁধে জোরে জোরে চাপড় মেরে বলতে লাগল, এই ঘোড়া, হ্যাট, হ্যাট! একি, তুমি যাচ্ছ না কেন? হ্যাট হ্যাট।

দু' একবার এদিক ওদিক গেলাম হামাগুড়ি দিয়ে। কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া কি সোজা? আমার হাঁটু ছড়ে যাবার উপক্রম।

এক সময় হাসি পেয়ে গেল। মনে মনে বললাম, কি হে, নীললোহিত, এখন কেমন লাগছে? সব সময় তো ফুরফুরে রোমান্টিক সেজে থাক, এবার?

৭

দিনের বেলা নরম শীত ছিল, কিন্তু অন্ধকার হবার পরই কনকনে ঠাণ্ডা একেবারে। শহর থেকে রাত্তিরের খাওয়া সেরে ফেরবার সময় পথটা মনে হয় যেন আর ফুরোয়ই না। হাত-পা জমে যাবে, নাকটা টুপুস করে খসে পড়বে। হাত দুটো তো পকেট থেকে বার করতেই ইচ্ছে করে না। বুলবুলের হাতে দস্তানা ও মাথায় টুপি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও সে চ্যাঁচাচ্ছে, উঃ কী শীত!

আমার গায়ে সোয়েটার, কোট, মাফলার, তবু মনে হচ্ছে মাথার একটা টুপি কালই কিনতে হবে। শুভ্রা চ্যাটার্জি গায়ের গরম চাদরটাই মাথায় ঘোমটার মতন দিয়ে নিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে টর্চ নেই। অন্ধকারে যে কোন সময়ে হোঁচট খাওয়ার ভয়। টর্চের কথাটা একদম খেয়াল করিনি, একটা কিনে নিলেও হতো।

আকাশ মেঘলা, চতুর্দিকে মিশমিশে অন্ধকার। শুধু লিদ্দার নদীর শব্দ আর জলের সামান্য আভাস চোখে পড়ে। সেই নদীর ধার দিয়েই পথ খুঁজে যাওয়া। তাঁবুগুলির দড়িতে মাঝে মাঝেই পা আটকে যাচ্ছে। বুলবুল তো দু'বার উল্টে পড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত আমাদের তাঁবু দুটির কাছে এসে পৌঁছোলাম। এবার বোঝা গেল, কেন অন্যরা এত দূরে তাঁবু ফেলে না। রাত্তিরবেলা ফেরার সময়টা সত্যি কষ্টকর। যাক, কাল গোটা দুই টর্চ কিনে নিলে অনেকটা সহজ হবে।

যেদিকটায় বেশি তাঁবু আছে, সেখানে দু' একটা বিজলি বাতি জ্বলে। আমাদের এখানে হ্যারিকেন। চার পাশের পাহাড়গুলো যেন এই অন্ধকারের মধ্যে অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। আমাদের পেছন দিকের ত্রিভুজাকৃতি পাহাড়টাকে মনে হয় যেন বিশাল এক কালো রঙের তাঁবু, আকাশের অনেকখানি ঢেকে আছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জি ও বুলবুল ওদের তাঁবুতে ঢুকে যেতেই আমি চলে এলাম আমারটায়। দৌড়ে সুটকেসটা খুলে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বার করে বড় একটা চুমুক দিতে শীতের কাঁপুনি যেন একটুখানি কমল। বিছানা থেকে কম্বলটা তুলে গায়ে জড়ালাম। এবার বেশ আরাম।

এখনো ন'টা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। অথচ মনে হয় যেন মাঝরাত্রি। এক্ষুনি শুয়ে পড়লে তো ঘুমও আসবে না। হ্যারিকেনের আলোয় বই পড়াও যায় না। অবশ্য খুব ছেলেবেলায় গ্রামে থাকবার সময় হ্যারিকেনের আলোতেই তো লেখাপড়া করেছি, কিন্তু এখন আর তা চলে না।

ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে টেবিলে এসেই বসলাম। এই রে, গেলাস তো ওদের ঘরে। এক বালতি জল এনে রেখেছি আমার তাঁবুতে কিন্তু দুপুরবেলা খাওয়ার পর আমার গেলাসটাও পাশের তাঁবুতে রয়ে গেছে। ব্র্যাণ্ডিতে জল না মিশিয়েও বোতল থেকে ঢেলে খাওয়া যায়। কিন্তু রাত্তিরে জল তেষ্টা পেতে পারে। তখন কি বালতি থেকে চুমুক দিয়ে খেতে হবে?

শুভ্রা চ্যাটার্জি নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েননি। মেয়েদের জামা-কাপড় ছাড়া, চুল আঁচড়ানো, মুখে ক্রিম ঘষা—এই রকম কয়েকটা ব্যাপার থাকে শুতে যাবার আগে। আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। পাশের তাঁবুর পর্দা ফেলা। আলো জ্বলছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, শুভ্রা, শুভ্রা! শুয়ে পড়েছেন নাকি?

পর্দাটা একটু সরিয়ে শুভ্রা চ্যাটার্জি বললেন, কী ব্যাপার!

—একটা গেলাস। আমার তাঁবুতে গেলাস নেই।

শুভ্রা চ্যাটার্জি একটা গেলাস এনে দিলেন, আমি সেটা হাতে নিয়ে বললাম, আচ্ছা! আপনারা শুয়ে পড়ুন, কাল সকালে দেখা হবে।

নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে হঠাৎ নিজেকে খুব একা মনে হলো। আমি একা থাকতেই অভ্যস্ত তবু এক এক সময় এই একাকিত্ব ভূতের মতন ঘাড়ে চেপে বসে। আমার তাঁবুটা ছোট, তবু সেটাকে মনে হয় এক বিরাট গহ্বর। তাই আনাচে

কানাচে অন্ধকার। বাইরেও রাশি রাশি অন্ধকার। মন খারাপ হয়ে যেতে চায়। তবু, না, এর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

সিগারেট ধরিয়ে মাঝে মাঝে ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে লাগলাম। কখনো উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছি, পাশের তাঁবুতে কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। না, কোন শব্দ নেই, কোথাও কোন শব্দ নেই, নদীর শব্দ ছাড়া। এ কিন্তু কলকুল ধ্বনি নয়, রীতিমতন গর্জন। কত বরফ থাকে একটা পাহাড়ের ওপরে যাতে এ রকম একটা নদী দিন রাত বয়ে গেলেও সে জল ফুরোয় না?

হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে আমি খেলা করতে লাগলুম। আর তো কিছুই করার নেই।

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে জানি না, অন্যমনস্ক হয়ে আমি কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলাম। কলকাতা মানেই অনেক কাজ, কত কাজ অসমাপ্ত বা অর্ধ-সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে, তারা হাতছানি দেয়। খুব মন খারাপ হলে আমি কলকাতার বাইরে কোথাও পালিয়ে যাই। আবার সেখানেও কয়েকদিন বাদেই কলকাতার জন্য মন কেমন করে। ঐ শহরটার সঙ্গে আমার যেন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন দাঁড়িয়ে গেছে। আমার মৃত্যুর পরেও কি ঐ শহরটা বেঁচে থাকবে? না, আমি আর কলকাতা বোধ হয় সহমরণে যাব।

এই সময় টেবিলের ওপর একটা ছায়া পড়ল। মুখ তুলে দেখি, শুভ্রা চ্যাটার্জি। হাউস কোটের ওপর একটা শাল জড়িয়ে এসেছেন। হাঁটুর তলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নগ্ন। বাঙালী মেয়েদের এইটুকু পা দেখতে পাওয়াই ভাগ্যের কথা।

—তুমি একা বসে বসে কী ভাবছ?

—কী জানি!

—আমারও এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার অভ্যেস নেই। বুলবুলকে ঘুম পাড়ালাম এতক্ষণ ধরে। তোমার এখানে একটু বসব?

—বসুন না।

—তুমি তখন আমাকে শুভ্রা শুভ্রা বলে ডাকছিলে কেন? শুভ্রা আবার আপনি—এ আবার কী রকম!

—নাম ধরে ডেকে আপনি বলা আমাদের কলেজ জীবনে বন্ধুদের মধ্যে ফ্যাসান ছিল। আগেকার ব্রাহ্মদের মতন। আপনাকে কি তুমি বলা উচিত ছিল?

—মোটেই না। তুমি আমাকে শুভ্রা মাসী বলতে পারতে।

আমি হেসে ফেললাম। সেই সময় গলার মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া ছিল; তাই দমক লেগে গেল। থামতেই চায় না।

শুভ্রা চ্যাটার্জি ঝুঁকে পড়ে আমার মাথার ওপর চাপড় মারতে লাগলেন। তাতে দমকটা কমে।

—এত হাসছ কেন? এতে হাসির কী আছে?

—আমি আপনাকে মাসী বলতে যাব কেন?

—আমি তোমার মাসীর বন্ধু, সেই হিসেবে—

—দীপান্বিতা নামে আমার কোন লেডি ব্রাবোর্নে ঝাড়া মাসী নেই। রামকৃষ্ণ মিশনে ফ্রেঞ্চ পড়ান—এমন কোন মহিলাকেও আমি চিনি না।

—সে কি, তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছিলে?

—হ্যাঁ, সাদা মিথ্যে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু আপনিও তো সেই মিথ্যেটা মেনে নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।

—তার মানে?

—আপনি আমার সঙ্গে চেনাশুনোর কোন একটা সূত্র খুঁজে বার করতে চাইছিলেন যে-কোনো উপায়ে। তারপরই ঝপ করে আমাকে তুমি বলা শুরু করলেন, বেশ একটা গুরুজনের ভাব দেখিয়ে, যাতে লোকে না কিছু মনে করে।

—লোক আবার কোথায়? এখানে কে কি বুঝতে যাচ্ছে?

—তবু বাঙালি মেয়ে তো, মনের মধ্যে একটা সংস্কার থাকেই। একেবারে অচেনা কোনো পরপুরুষের সঙ্গে কোথাও যাওয়া—বাঙালি মেয়েরা তা ঠিক পারে না—তার ওপর যদি হোটেলে এক ঘরে থাকতে হতো—সে তো এক সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার—

—কিছুই না পাওয়া গেলে হোটেলের এক ঘরেই থাকতাম!

—না, তা হয় না। নিজের স্বামীকে খুঁজতে এসে কোন নারী আর একজন লোকের সঙ্গে হোটেলের এক ঘরে থাকে না।

—তুমি আমাকে একটু খোঁচা মারার জন্যই দুটো তাঁবুর কথা বলেছিলে?

—হোটেলের এক ঘর আর এক তাঁবু তো একই ব্যাপার!

—না, এক ব্যাপার নয়। সবটাই লোকলজ্জার ব্যাপার। হোটেলে আরো অনেক লোকজন থাকে। আমরা নিজেরা ঠিক থাকলেও অন্য লোক তা বুঝবে না। এখানে তো আর অন্য কেউ নেই!...তুমি হঠাৎ এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন আমার সঙ্গে?

আমি সচকিত হয়ে গেলাম। সত্যিই আমার গলায় একটু ঝাঁঝ এসে গিয়েছিল। শুভ্রা চ্যাটার্জিকে আঘাত দিতেই চাইছিলাম আমি। কেন? নিশ্চয়ই এটা ব্র্যাণ্ডির প্রতিক্রিয়া। একটু নেশা হলেই আমার এরকম হয়। নিজেকে সামলে নিলাম। এটা ঠিক, শুভ্রা চ্যাটার্জির মনের মধ্যে এখন একটা দারুণ তোলপাড় হচ্ছে—এসময়

তাঁর সহানুভূতির প্রয়োজন। তাঁকে আঘাত দেওয়া অমানবিকতা।

ব্র্যাণ্ডিতে আর একটা চুমুক দিয়ে আমি হাসলাম। তারপর বললাম, মাঝে মাঝে আমার কথাবার্তা একটু রূঢ় হয়ে যায়, কিন্তু রাগিনি, রাগব কেন আপনার ওপর!

—আমার পায়ে খুব ঠাণ্ডা লাগছে। আমি চেয়ারের ওপর পা তুলে বসব? কিছু মনে করবে না?

—না, না, বসুন না।

উঠে গিয়ে আমি বিছানার ওপর থেকে আর একটা কম্বল এনে বললাম, এটা জড়িয়ে বসুন, আরাম লাগবে। কোন কোন জায়গায় খবর নিলেন আজ? নতুন কিছু পাওয়া গেল?

—নাঃ! সকলেরই কী রকম যেন একটা দায়সারা ভাব। আসলে এত টুরিস্ট এসেছে তো, সবাই তাই নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। কেউ আর অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। একজন লোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অমনি সবাই ধরে নিচ্ছে যে, সে মারা গেছে!

—এখানকার পুলিস কী বলল?

—ঐ একই কথা। সরকারী তদন্তের রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, তার বেশি আর কিছু বলার নেই! একটা লোক যে ইচ্ছে করে লুকিয়েও থাকতে পারে, সে কথা ওরা কিছুতেই বুঝবে না।

—মিঃ চ্যাটার্জি তো উড স্টক হোটেলে ছিলেন। ওঁর সব জিনিসপত্র সেখানেই পড়ে আছে?

—না, সে তো আমার ভাসুর যখন এসেছিলেন, তাঁর কাছেই সব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। উড স্টক হোটেলেও আমি গিয়েছিলাম। ন্যাচারালি, সে ঘরে এখন অন্য লোক আছে। হোটেলের লোকরা কিছু বলতে পারল না।

—এরপর আপনি কী করতে চান?

—কী করা যায় তুমিই বলো তো!

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কিছুই বলার নেই।

একটুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলাম। তারপর শুভ্রা চ্যাটার্জি হঠাৎ বললে, এ কি, তুমি মদ খাচ্ছো?

—হ্যাঁ, এটা ব্র্যাণ্ডি! আপনি খাবেন একটু?

—রক্ষে করো। আমার বিচ্ছিরি লাগে—

—আপনি খেয়ে দেখেছেন কখনো?

—হ্যাঁ, স্বাদটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। তোমাদের ঐ জিনিস সব

রকমই আমি চেখে দেখেছি, কোনটাই ভালো লাগেনি।

—আমি খেলে আপনার আপত্তি নেই তো!

—আমি আপত্তি করলেও কি তুমি শুনবে? তোমার ওপর জোর করার সে-রকম কোন অধিকারও আমার নেই। ও তো প্রত্যেক সন্ধেবেলা বাড়িতে এসে হুইস্কি খেত।

কমলেশ চ্যাটার্জি বড় ইঞ্জিনিয়ার, নিশ্চয়ই বিলেত বা আমেরিকা ফেরৎ, হুইস্কিসেবী, তার ওপরে আবার স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত—সব মিলিয়ে ছবিটা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু হুইস্কিসেবী লোকরা কি চট করে সাধু হয়ে যেতে পারে? কমলেশ চ্যাটার্জির ছবি আমি দেখেছি, বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, বেশ ধারালো চোখ ও নাক—সর্বত্যাগী হবার মতন কোন চিহ্ন নেই। হুইস্কির নেশা ছাড়তেই তো একটা লোকের ছ' মাস বা এক বছর লেগে যায়।

—আপনি বলছেন, উনি ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সে রকম কি লোকে করে? উনি নিশ্চয়ই ওঁর মেয়েকে এবং আপনাকে ভালোবাসতেন—হঠাৎ তাদের কথা ভুলে গিয়ে...এরকম গল্পে হয়—কাছাকাছি জীবনের মধ্যে দেখা যায় না।

—আমাকে ভালোবাসতেন কি না জানি না। তবে বুলবুলের ওপর টান ছিল।

—আপনাকে ভালোবাসতেন কিনা জানেন না আপনি?

—সত্যিই জানি না। এগারো বছর আগে বিয়ে হয়েছে, আমরা নিজেরাই বিয়ে করেছিলাম, আগে ভেবেছিলাম সেটা ভালোবাসা—পরে বুঝেছি আস্তে আস্তে, এটা ঠিক ভালোবাসা নয়, সুখী হবার চেষ্টা...আমরা তো তাই করি, একজন কারুকে ভালো লাগে, তার চেহারা, সামাজিক অবস্থা—এগুলোও ভেবে দেখি, তখন মনে হয় একে বিয়ে করলে সুখী হবো—এরকমই হয় না? এর নাম ভালোবাসা? ভালোবাসার উন্মাদনা বলতে যা বোঝায় তা কখনো আমি টের পাইনি! না, ওর সঙ্গে আমার ভালোবাসা ছিল না, অন্তত গত তিন চার বছর...তবু পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়া, খানিকটা স্নেহ বা যত্ন।

শুভ্রা চ্যাটার্জি হঠাৎ টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কান্নাটা এমনই আকস্মিক যে আমি একেবারে শিউরে উঠলাম। অসম্ভব নির্জন এই জায়গা, চার পাশে এত অন্ধকার, তার মধ্যে একটি নারীর কান্না—মনে হয় যেন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিই কাঁদছে।

শুভ্রা চ্যাটার্জির কান্নার ধরনটাই এই রকম আকস্মিক। আগের মুহূর্তেও বোঝা যায় না। কান্নার সময় ওঁর বোধহয় মনে থাকে না যে কাছাকাছি কোন মানুষ আছে।

এখন আমার কী করা উচিত। কোনো সান্ত্বনা দিতে পারি আমি? তবু উঠে গিয়ে, পিঠে হাত রেখে? না, আমার ভয় করে। নিজেকেই। একবার ছুঁয়ে দিলেই যদি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যাই?

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। কারুর কান্না দেখলে আমার বড্ড কষ্ট লাগে। অথচ দৃশ্য হিসেবে একটি সুন্দরী রমণীর কান্না খবুই সুন্দর। আমি ভেতরে ভেতরে কষ্ট পেয়েও মুগ্ধ হয়ে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম। শুভ্রা চ্যাটার্জি আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। কেন এই কান্না? ভালোবাসা ছিল না বলে?

একটু পরে উনি মুখ তুললেন। অশ্রুবর্ষণের কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে বললেন, তোমার ঘুম পাচ্ছে না তো? আমি আর একটু বসব?

—হ্যাঁ, বসুন না! আমি অনেক পরে ঘুমোব।

—বুলবুল জেগে থাকলে তো সব কথা বলা যায় না। আচ্ছা, তুমি কখনো কারুকে ভালোবেসেছো?

—হ্যাঁ। একটি ফরাসী মেয়েকে। তার নাম মার্গারিট।

—ফরাসী মেয়ে? সে কোথায়? এদেশে থাকে?

—না।

—এদেশে নেই? কবে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—সে এক লম্বা কাহিনী। সে কথা আমি এখন বলতে চাই না। বরং আপনার কথাই শুনি।

—আমি খুব স্বার্থপর, তাই না? শুধু নিজের ব্যাপার নিয়েই তোমাকে বিব্রত করে রেখেছি। আর কেউ বোধহয় হঠাৎ প্রায় একজন অচেনা মানুষকে এরকম এত দূর টেনে আনে না!

—আপনি কিছু না জেনেশুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, আমি তো খারাপ লোকও হতে পারি!

—কেন, মানুষ কেন খারাপ হবে? বিনা কারণে, কেউ কেন অন্য একজনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে?

—তবু তো এরকম হয়—

—তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম, তুমি সেরকম কিছু করবে না!

—সেই জন্যই আমার সঙ্গে মাসীর সম্পর্ক পাতাতে চেয়েছিলেন? কিন্তু আমি কোন অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গেই মাসী, পিসী, দিদি বা বোনের সম্পর্ক পাতাতে চাই না।

—নাই বা হলো সেরকম কোন সম্পর্ক। বন্ধুত্বও তো হতে পারে।

—মেয়েরা কখনো পুরুষদের বন্ধু হবার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। তারা ভয় পায়।

—কেন, আমি তোমাকে ভয় পাব? কক্ষনো না।

—তুমি ভয় পাবে না?

আমি সোজাসুজি তাকিয়ে রইলাম ওঁর চোখের দিকে। উনিও চোখ সরালেন না। যেন এটাই একটা ভয়ের পরীক্ষা। আমার আঙুলের ডগায় একটা জ্বালা জ্বালা ভাব। এক্ষুনি লাফিয়ে গিয়ে যদি শুভ্রা চ্যাটার্জিকে জড়িয়ে ধরি, উনি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবেন না? সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আমার দারুণ ইচ্ছে হয়। আমি ওঁকে জড়িয়ে ধরে বলব, বোকা মেয়ে এই শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে আলাদা দূরে দূরে বসে থাকার চেয়ে এক শয্যায় শুয়ে থাকা অনেক ভালো নয়?

কিন্তু আমার বুক কাঁপছে। এসব কথা মনে মনেই বলা যায়, মুখ ফুটে কোন নারীকে কখনো বলিনি। সাহস বাড়াবার জন্য আমি ব্র্যাণ্ডির বোতলটা তুলে আবার চুমুক দিলাম। সে জন্য চোখ সরাতে হলো, অমনি ঘোর কেটে গেল।

শুভ্রা বললেন, তুমি অত বেশি খেও না। আর খেও না, লক্ষ্মীটি!

—হ্যাঁ, আমাকে আরো অনেকটা খেতে হবে।

—খেতেই হবে? কেন?

—একথা থাক। অন্য কথা বলুন।

—কী আশ্চর্যভাবে তোমার সঙ্গে আলাপ, তাই না? যদি আগে দেখা হতো।

—আগে দেখা হলে কী হতো?

—তা জানি না, তবে এখন আমি শুধু নিজের কথা বলছি, তোমার কথা কিছুই শোনা হলো না—

—আমি সামান্য লোক, আমার সম্পর্কে কিছুই জানবার নেই—

—তুমি কি আমার ওপরে রাগ করে আছ?

—রাগ করব কেন? শুভ্রা, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি একটা ছোট্ট মেয়ে।

—ছোট্ট মেয়ে? তুমি আমাকে হাসাতে চাও নাকি? আমি বয়েসে তোমার সমানই হবো—

—তোমার বয়েস অনেকদিন আগে এক জায়গায় থেমে আছে—

—আমার বিয়েই তো হয়ে গেল এগারো বছর। কমলেশ বলত—

—কমলেশ, ও, তোমার স্বামী? আমি এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা। আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দিন তো! আপনি বললেন, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর

মধ্যে তেমন ভালোবাসা ছিল না—তবু আপনি তাকে এমন পাগলের মতন খুঁজতে এসেছেন কেন?

—তুমি এটা বুঝতে পারছ না? ও যদি সত্যিই মরে না গিয়ে থাকে, যদি পালিয়ে যায়—তা হলে আমাকে কতবড় অপমান করেছে? ও যদি এমনি চলে যেতে চাইত, আমি কি ওকে আটকাতাম? আমার আত্মসম্মান নেই? কেন ও আমাকে কিছু বলে গেল না!

—আপনি কষ্ট পাবেন বলে আমি এতক্ষণ বলতে পারছিলাম না। আমার ধারণা, উনি বেঁচে নেই। ওঁর পক্ষে বেঁচে থাকা আর সম্ভব নয়। কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

—এরকম দুর্ঘটনা হতে পারে। তাতে কিছুই করার নেই। কষ্ট কি পাব না? নিশ্চয়ই পাব। এতদিন কাছাকাছি থাকার ফলে যে একটা সম্পর্ক দাঁড়ায়—সেটা প্রেম ভালোবাসা না হলেও খুব কম কিছু নয়। কষ্ট হবেই। কিন্তু ও যদি ইচ্ছে করে চলে গিয়ে থাকে, তবে এটা হবে আমার পক্ষে দারুণ অপমানের। সেটাই শুধু আমি জেনে যেতে চাই।

—আপনার স্বামী ছাড়া অন্য কারুকে ভালোবেসেছেন কখনো?

—জানি না। আমি হয়তো ভালোবাসতেই জানি না। কিন্তু ভালোবাসার জন্য দারুণ একটা প্রতীক্ষা ছিল মনের মধ্যে। বোধহয় শেষ পর্যন্ত বুঝতেই পারলাম না, ভালোবাসা চাই, না সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চাই! আচ্ছা, তোমাকে তখন জিজ্ঞেস করলাম তুমি কারুকে ভালোবেসেছ কিনা। তুমি সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বললে। তোমার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই। আচ্ছা, তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে, কী ভাবে ভালোবাসতে হয়?

আমি একটু হাসলাম। মেয়েরা ভালোবাসার আলোচনা করতে ভালোবাসে। সত্যি কথাটা শুনতে চায় না। ভালোবাসার একটা রঙীন ছবি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে।

আমি বললাম, না, তাতে একটু অসুবিধে আছে।

—কেন?

—আমার ভালোবাসার ধারণাটা একটু উগ্র। তার মধ্যে একটা শরীর আছে। রক্ত-মাংসের শরীর বাদ দিয়ে কোন ধোঁয়াটে ভালোবাসায় আমি বিশ্বাস করি না।

—আমি বোধ হয় তোমাকে ভুল সময় কথাটা জিজ্ঞেস করেছি।

দেশলাইটা নীচে পড়ে গিয়েছিল। ঝুঁকে সেটা তুলতে গিয়ে আমার চেয়ারটা একটু টলে গেল। শুভ্রা চ্যাটার্জি হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরলেন, না হলে আমি পড়েই যেতাম। উনি বললেন, তোমার নেশা হয়ে গেছে। তুমি এবার শুয়ে পড়ো।

—না ভাই শুভ্রা, আমার নেশা হয়নি। কাঠের পাটাতনগুলো আলগা,

এমনিতেই সব কিছু নড়বড় করে। তোমার হাতটা কী গরম!

আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শুভ্রা চ্যাটার্জি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, আমি এবার যাই!

—আচ্ছা!

—তুমি কি এখনো এখানে বসে থাকবে?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ!

—কেন?

—এমনিই। আপনি যান না শুতে?

—আমাকে এক একবার তুমি বলে ফেলেছ, তাতে আমি কিছু মনে করিনি। আমাকে তুমি তুমি বলতে পারো।

—ওতে কিছু যায় আসে না?

—সত্যিই কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি আর কতক্ষণ এরকম একা একা বসে থাকবে?

—তাতে আপনার কী অসুবিধে হয়েছে? আপনি শুতে যান না। থাক—

—তুমি আবার আমার ওপর রেগে রেগে কথা বলছ?

সত্যি আবার শুভ্রা চ্যাটার্জির ওপর আমার খুব রাগ এসে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা ছটফটানি। কেন এই মহিলা আমাকে এখানে টেনে এনেছেন? কেন এমন নির্জন অন্ধকার রাত্রে আমার সামনে? আমি তো একটা নিতান্ত সাধারণ মানুষ। আমার কি লোভ, মোহ এসব থাকতে পারে না?

বাইরে থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এলো, শুভ্রা চ্যাটার্জি শীতে কেঁপে উঠলেন। আমার শীতবোধ অনেকটা কমে গেছে। আমি শুভ্রা চ্যাটার্জির কথার কোন উত্তর দিইনি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, যেন অনেক সময় কেটে গেছে বহুক্ষণ...আমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা বিরাট স্তব্ধতার দূরত্ব।

—তা হলে আমি যাই?

শুভ্রা চ্যাটার্জি আমার অনুমতি চাইছেন, কেন? আমি হাত তুলে বললাম, দাঁড়াও!

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর সামনে এসে বললাম, আচ্ছা শুভ্রা, তুমি যখন ছোটো ছিলে, খুব ছোটো না, কিশোরী, যখন তুমি বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতে, তোমার সেই সময়টার কথা বলো তো!

শুভ্রা চ্যাটার্জির ভুরুতে নদীর বাঁকের মতন বিস্ময় ফুটে উঠল। সামান্য একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, এসব কী বলছ তুমি? আমি যখন ছোটো ছিলাম...সেকথা শুনে তোমার কী হবে?

—হ্যাঁ, বলো, সেইসব দিনের কথা, যখন তুমি কিশোরী, নিষ্পাপ, চোখে অনেক স্বপ্ন—তোমার সেই দিনগুলো আমি দেখতে চাই! তুমি একটা সাদা ফ্রক পরেছ, রাজহংসীর মতন...তখন তোমাকে আমি চিনতাম। চিনতাম না?

—কী পাগলের মতন কথা বলছ? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারছ না? এটা কি গ্রীক? আমি তো খুব সরল কথা বলছি, তোমাকে আমি দেখতে চাই, তুমি বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লিখছ, চিঠি কিংবা অন্য কিছু, তোমার বয়েস পনেরো কিংবা ষোলো—আমি তোমাকে সেখানে দেখতে চাই।

—আমি কি আর সেখানে ফিরে যেতে পারি?

—পার না? তুমি তা হলে কী পার? তুমি কী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ এখান থেকে?

আমার মনে হলো, শুভ্রা চ্যাটার্জি কিছু একটা বলার জন্য আমার কাঁধে হাত রাখবেন। তাই, প্রায় হরিজনের মতন, আমি সন্ত্রস্তভাবে পিছিয়ে গেলাম একটু। তারপরই বুঝলাম, উনি আমার কাঁধে হাত রাখতে চাননি, কপালের ওপর থেকে এক গুচ্ছ চুল সরালেন। চোখ দুটি প্রায় নিষ্পলক। দুর্গা প্রতিমার মতন মুখ। সেই মুখে এখন দুঃখের আঁকা বাঁকা রেখা।

—আমি যাই?

—বার বার একথা জিজ্ঞেস করছ কেন? এবার বুঝি ভয় করছে আমাকে! আমি কি তোমাকে আটকে রেখেছি। না, না, তুমি যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

—ভয়? না, ভয় পাব কেন? তুমি কি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? বুঝতে পারছি না তো?

—না, ভয় দেখাতে আমি চাই না। তুমি সেখানে আর ফিরে যেতে পার না—সত্যিই? না? সেই সারল্য, সেই স্বচ্ছ জীবন...

—ফেরা যায়?

—যায় না বুঝি? ঠিক আছে, তুমি তাঁবুতেই যাও। আমি পৌঁছে দিচ্ছি...

—না, আমি যাচ্ছি, তুমি আর এসো না। আমার মনটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে গেল। তুমি কেন আমাকে এইসব কথা বললে?

—আমি উল্টোপাল্টা কিছু বলেছি বুঝি? খুব দুঃখিত, আমি কিছু ভেবে বলিনি, এমনি যা মনে এলো।

কম্বলটা গা থেকে খুলে শুভ্রা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, ঠিক আছে, তা হলে কাল সকালে—

আমি ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। শুভ্রা টুপ করে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল। তারপর আবার ওর তাঁবুর সামনে হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোর মধ্যে জেগে উঠল! তাঁবুর দরজার কাছে ভাস্কর্য হয়ে স্থির রইল কয়েক মুহূর্ত। যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে। তারপর মিলিয়ে গেল ভেতরে।

সিগারেটটা শেষ করে একটু বাদে আমিও চলে এলাম বিছানায়। কী অসম্ভব ঠাণ্ডা এই বিছানা। নীচে দুটো কম্বল পাতা, গায়ে দুটো কম্বল, তবু যেন মাটি ভেদ করে শীত উঠছে। আমার হাতের তালু, পায়ের পাতা গরম, শুধু বুক আর পিঠের কাছে কনকনানি। হাত দুটো বার বার কাকে যেন ধরতে চাইছে। কত মধুর উষ্ণতা আসতে পারত এই বুকে...

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পরেও টের পেলাম, ঘুম আসবার কোন চিহ্নমাত্র নেই। চোখ দুটো খরখর করছে। এইভাবে কী সারারাত জেগে থাকব? তখন মনে পড়ল, ব্র্যাণ্ডির বোতলটা পুরো শেষ হয়নি, খানিকটা তলানি পড়েছিল। ওটুকু আর রেখে লাভ কী?

আবার কম্বল জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। বোতলটা খুঁজে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলাম সবটুকু। তারপর তাঁবুর বাইরে এসে বোতলটা ছুঁড়ে দিলাম নদীর দিকে। ঝনঝন শব্দ হলো। জলে পড়েনি বোতলটা, পাথরে লেগেছে—শব্দটা খুব চমৎকার শোনাল।

শুভ্রা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

ও আমাকে একা বসিয়ে রেখে যেতে চাইছিল না। ওর মনে কষ্ট ছিল। ঘুম কি সেই কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে?

ওর তাঁবুর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম নিঃশব্দে। দরজার দড়িগুলো ভেতর দিকে বাঁধা, কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে। বাইরে থেকে এই দড়ির বাঁধন খুলে ফেলা কিছুই শক্ত নয়। ভাগ্যিস এদিকে কোন চোর নেই।

ফাঁকের মধ্যে আমি চোখ রাখলাম। হ্যারিকেনটা পুরো নেভায়নি, কালিমাময় অল্প আলোয় শুভ্রার শায়িত দেহের রেখা অস্পষ্ট দেখা যায়। বোঝা যায় না, ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। ডাকব? ডেকে বলব, শুভ্রা, তোমার বুকের কাছে শীত করছে না? চলো আমরা ফিরে যাই নিষ্পাপ কৈশোরে, যেখানে তুমি সাদা ফ্রক পরা রাজহংসীর মতন, উজ্জ্বল দাঁতের আলো দেখিয়ে হাসবে, কোন দুঃখ নেই, গোটা পৃথিবীটা বিপুল সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত—

এ কী অসম্ভব চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছে? হঠাৎ শুভ্রার কৈশোর নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা কেন? শুধু এখন বুকের কাছে শীত...ডাকব শুভ্রাকে? যদি না আসে? যদি না আসে, তা হলে পৃথিবীর আর কোন নারীকে কি আমি

ডাকতে পারব কখনো? যদি না আসে, আমি তো জোর করে এই দড়ির বাঁধন খুলে ভেতরে যেতে পারব না!

আর যদি উঠে আসে, তাহলে আর আমি ওকে ছাড়ব না। আমি ওকে আমার বুকের মধ্যে পিষে ফেলে...আমরা সারারাত এক বিছানায়, এক কম্বলের তলায়। ...কিন্তু তাহলে ওর সমস্ত খোঁজাখুঁজি মিথ্যে হয়ে যাবে!

এক তৃষ্ণার্ত প্রেতের মতন আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ওর শরীরের সামান্য নড়াচড়া লোভীর মতন দেখছি। আমার নিশ্বাসের শব্দ সম্পর্কেও সতর্ক। শুভ্রা যেন কিছুতেই টের না পায়। আমার একমাত্র আশা, ও যদি নিজে থেকে একবার উঠে আসে। ও তো বলেছিল, আমাকে একা বসিয়ে রেখে ওর শুতে যেতে ইচ্ছে করে না!

কতক্ষণ যে কেটে গেল! শুভ্রা উঠল না। মেয়েদের সচরাচর নাক ডাকে না, তাই ও ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের নড়াচড়ার শব্দও অন্যরকম। কিন্তু নদীর গর্জনে সেই শব্দ বোঝবার উপায় নেই। আমার দু পা দিয়ে সাপের মতন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে শীত, আমার কোমরের কাছটা অবশ করে দিচ্ছে। আর দাঁড়ানো যায় না। ফিরে এলাম তাঁবুতে। নিজের শরীরটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

৮

পরদিন সকাল থেকেই রটে গেল যে রাস্তার ওপর থেকে পাথর সরাবার কাজ আগের দিন সন্ধেবেলা থেকেই শুরু হয়ে গেছে। জম্মু থেকে বিশেষজ্ঞ দল এসেছে। আজ দুপুরের মধ্যেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আমরা এতদূর থেকেও কয়েকবার ডিনামাইটের শব্দ শুনতে পেলাম।

অন্যান্য তাঁবুগুলোতে এবং পহলগামের রাস্তায় সকলের ফিরে যাওয়ার তোড়জোড়। অনেকের রেলওয়ে রিজার্ভেশনের তারিখ পেরিয়ে গেছে, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা। আজ দুপুরেই পঁয়ত্রিশখানা বাস ছাড়বে শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে।

সকালবেলা চা খেতে গিয়ে আমরা এইসব তথ্য সংগ্রহ করে আনলাম। ফিরে এসে বসলাম বড় তাঁবুতেই। শুভ্রা চ্যাটার্জির মুখখানা ম্লান। একবার বললেন, কাল রাত্তিরে আমার একদম ভালো ঘুম হয়নি, কিছুতেই ঘুম আসতে চাইছিল না। আজ একটু স্নান করতে পারলে ভালো হতো!

তাঁবুর পেছনে পর্দা ফেলে ছোট একটা স্নানের জায়গা মতন করা আছে।

আমি বললাম, আমি নদী থেকে দু' বালতি জল এনে দিচ্ছি, স্নান করে নিন না।

কিন্তু বুলবুল নদীতেই স্নান করবে বলে বায়না ধরেছে। কিছুতেই তাকে নিরস্ত করা যায় না। বার বার সে নদীর দিকে ছুটে যেতে চায়। নদীর জল সকালের দিকে আরো বেশি ঠাণ্ডা। ভোরবেলা মুখ ধোওয়ার সময় এক গাল জল নিয়ে কুলকুচো করতে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন খুব গরম্ কোন জিনিস মুখে নিয়েই যেমন ফেলে দিতে ইচ্ছে করে, এই জলেরও সেইরকম অবস্থা।

শুভ্রা চ্যাটার্জি মেয়েকে বার বার বকুনি দিয়েও সামলাতে পারছেন না। দুরন্ত মেয়ের সেই এক দাবি, আমি নদীতে চান করব।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি ওকে নদী থেকে চান করিয়ে নিয়ে আসছি।

বুলবুল চোখ পাকিয়ে বলল, আমি কিন্তু ডুব দেব, তুমি আমার মাথায় মগে করে জল ঢালতে পারবে না।

—ঠিক আছে, ডুব দেবে, তাই চলো।

আগে দু' বালতি জল তুলে শুভ্রা চ্যাটার্জির তাঁবুতে পৌঁছে দিলাম। তারপর বুলবুলকে বললাম, এবার চলো। চান করে উঠে গিয়ে কিন্তু কাঁদতে পারবে না!

শুভ্রা চ্যাটার্জি শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু হবে না তো?

আমি বললাম, কোন ভয় নেই। নদীর জল, এরকম রানিং ওয়াটার, এতে কোন অসুখ হয় না।

বুলবুলের দু' হাত ধরে উঁচু করে ঝুলিয়ে নিয়ে এলাম নদীর ধারে। বড় বড় পাথরগুলোর ওপর পা ফেলে ফেলে খানিকটা দূরে এলাম। প্রথমে অল্প জলে ওর পা ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী, কেমন ঠাণ্ডা? এখনো চান করবে?

বাচ্চাদের বোধহয় শীতবোধ কম। কিংবা ঐটুকু মেয়েরও জেদ সাংঘাতিক। সে তখনো বলে, হ্যাঁ, করব।

—ডুব দেবে?

—হ্যাঁ, দেব!

খুব শক্ত করে ওর দু' হাত ধরে আমি গভীর স্রোতের মধ্যে ওকে একবার ডুবিয়েই তুলে আনলাম। কিন্তু তার আগে আমার সারা দেহে একটা ঝাঁকুনি লাগল। কাজটা ঠিক হয়নি। স্রোতের এমনই তীব্র টান যে বুলবুল সমেত আমাকেও টেনে নিয়ে যেতে পারত—যদি আমার পা সামান্য পিছলে যেত।

জল থেকে তোলার পরও বুলবুল দম আটকে যাবার মতন আঁ আঁ করে চিৎকার করছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। আমি ওকে তোয়ালেতে জড়িয়ে কোলে করে নিয়ে ছুটে এলাম আমার তাঁবুতে। তারপর ওকে কম্বলের মধ্যে মুড়ে ফেললাম। সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে তারপর মুছে দিলাম ওর মাথা আর গা।

এখন ও সুস্থ হয়ে উঠেছে। দুষ্টুমি করে বলল, কাকু, তুমি চান করবে না নদীতে ? কী ভালো লাগে !

বাইরে ঝকঝক করছে রোদ। জামা কাপড় পরিয়ে বুলবুলকে বাইরে রোদে এনে বসিয়ে দিলাম। কিন্তু ও তো ঠাণ্ডা হয়ে বসবে না এক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। অর্থাৎ এখনো শীত কাটাচ্ছে। হাল্কা একটা প্রজাপতির মতন বুলবুল দৌড়তে দৌড়তে অনেক দূর চলে গেল। যাক, ক্ষতি নেই। ও আর এখন নদীর জলে নামতে চাইবে না।

স্নান সেরে শুভ্রা চ্যাটার্জি একটা নতুন শাড়ি পরে বেরিয়ে এলেন। হাল্কা ছুঁতে রঙের সিল্ক। ভিজে চুলে মেয়েদের মুখে একটা চিক্কণ ভাব আসে।

[redacted]

—ওঁর কাছে ঠিক কত টাকা ছিল, তার হিসেব তো জানি না। তবে, ওর সুটকেসের মধ্যে বেশ কিছু টাকা পাওয়া গেছে। তাই মনে হয়, ওর পকেটে সামান্য কিছু টাকা থাকলেও থাকতে পারে, বেশি কিছু না—

—অর্থাৎ উনি ইচ্ছে করে নিরুদ্দেশ হলে সব টাকা নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

—কিন্তু যদি কেউ সাধু হয়ে যেতে চায়, তা হলে কী টাকা পয়সার কথা চিন্তা করবে?

—শিক্ষিত সাধু সন্ন্যাসীদের টাকা পয়সা লাগে নিশ্চয়ই। তারা কি ভিক্ষে করে আহার্য জোটাতে পারে? অবশ্য, উনি ইচ্ছে করে হোটেলের ঘরে সুটকেসের মধ্যে কিছু টাকা রেখে যেতে পারেন, যাতে অন্যদের এই ধারণা হয়, উনি ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাননি। হয়তো, গোপনে ওঁর কাছে আরো বেশ কিছু টাকা ছিল।

—সে সম্ভাবনা খুবই কম। ওর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউনট যেমন ছিল তেমনি আছে। আলাদা টাকা আসবে কোথা থেকে?

—আপনি তা হলে এখন কী করতে চান? আমরা এখন তাহলে এখানেই থাকব?

—তুমি কাল রাত্তিরে আমাকে তুমি বলছিলে। আজ আবার আপনি বলছ কেন?

—কাল বোধহয় বেশি ব্র্যাণ্ডি খেয়ে আমার নেশা হয়ে গিয়েছিল।

—কই, সেরকম মনে হয়নি তো! শুধু একটু অদ্ভুত ধরনের কথা বলছিলে। আমি তোমাকে আগ বাড়িয়ে তুমি বলেছি, তুমিও আমাকে অনায়াসেই তুমি বলতে পার।

—তা পারি। কিন্তু বুলবুল কী ভাববে? এতক্ষণ ওর মাকে আমি আপনি বলছিলাম, হঠাৎ যদি তুমি বলতে শুরু করি?

—ও কিছু বুঝবে না।

—বাচ্চারা অনেক কিছু বোঝে!

—আমি বলছি তো, তাতে কিছু হবে না। আমার স্বামীর বন্ধুরা অনেকেই আমাকে তুমি বলে। এতে অস্বাভাবিক কী আছে?

—প্রথম দিনই কেন এ কথা তোমার মনে পড়েনি?

—তখনো তো তোমাকে ভালো করে চিনতাম না।

—ভালো করে না চিনেই বুঝি একজনকে তুমি বলে ডাকা শুরু করা যায়?

—তুমি আবার আমার সঙ্গে রেগে কথা বলতে শুরু করলে? আমার সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে না।

—আচ্ছা, এইমাত্র যদি কমলেশ চ্যাটার্জি এখানে এসে হাজির হন, তাঁর কাছে আমার কী পরিচয় দেবে?

—বলব, তুমি আমার একজন নতুন বন্ধু।

হঠাৎ গলা চড়িয়ে শুভ্রা বলল, তুমি কি ভাবছ, আমি আমার স্বামীকে ভয় করি? ও যদি ফিরে আসে, আমি তার পরেও ওর সঙ্গে থাকব? কক্ষনো নয়! ও আমাকে অপমান করেছে। আমি শুধু আসল সত্যিটা জেনে যেতে এসেছি।

আমি একটু নরমভাবে বললাম, উনি যদি ফিরে আসেন, উনি নিশ্চয়ই তোমার কাছে ক্ষমা চাইবেন। উনি তোমাকে অপমান করতে চাননি। ধর্মের টানে যাঁরা ঘর ছাড়ে তারা কি কারুকে অপমান করতে চায়? চৈতন্যদেব কি তাঁর স্ত্রীকে অপমান করতে চেয়েছিলেন? অন্যদিকের টানটা হঠাৎ বেড়ে যায় বলেই—

—ওসব বড় বড় কথা আমি শুনতে চাই না। আমার স্বামী চৈতন্যদেব নন, নিতান্ত সাধারণ মানুষ।

—তাহলে আমরা এখন কী করব, এখানেই থাকব?

—আমি একবার অমরনাথ পর্যন্ত যেতে চাই।

—অসম্ভব! কাল সন্ধেবেলা আমি ভালো করে খবর নিয়েছি। জুলাই মাসের আগে রাস্তা খুলবে না। এখন ওদিকে যাওয়া অসম্ভব।

—পায়ে হেঁটেও যাওয়া যাবে না?

—না।

—কিন্তু অসম্ভব কাজও তো কেউ কেউ করতে চায়। কমলেশ স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, ও কি একবার চেষ্টা না করে ছাড়বে? তুমি জানো পহলগামে, হয়তো আমরা যেখানে আছি এই জায়গাতেই স্বামীজী তাঁবু খাটিয়ে ছিলেন। নিবেদিতা খৃষ্টান বলে তাঁকে অমরনাথে যেতে দিতে অনেক সাধু আপত্তি জানিয়েছিল।

—শেষ পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন তো?

—হ্যাঁ! কাল বললাম না, স্বামীজী নিবেদিতাকে অমরনাথে শিবের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন! শেষ পর্যন্ত নাগা সাধুরা বিবেকানন্দকে সমর্থন করেছিলেন।

ধর্মের গোঁড়ামিগুলো এরকম উদ্ভটই হয়। অমরনাথের রাস্তার চড়নদাররা সবাই মুসলমান। একদল মুসলমান রাখালই তো প্রথমে ঐ গুহা আর বরফের শিবলিঙ্গ আবিষ্কার করে।

—তুমি ওখানে গেছ?

—হ্যাঁ, আগেরবার।

—সেইজন্যই তোমার আর যাওয়ার আগ্রহ নেই। শোনো, তোমাকে আমি জোর করে আটকে রাখতে চাই না। তুমি ইচ্ছে করলে আজই ফিরে যেতে পারো। আমি ঐ দিকে একবার যাবার চেষ্টা করবই। এতদূর যখন এসেছি, তখন শেষ না দেখে—

—এটা এক ধরনের পাগলামি ছাড়া কিছুই না।

—হয়তো তাই। সবাই আমাকে জেদী বলে।

—তোমার মেয়েটিও তোমার মতনই জেদী হয়েছে।

—তুমি কাল রাত্তিরে অনেকক্ষণ জেগে ছিলে?

—হ্যাঁ।

—আমাকে ডাকলে না কেন? তোমার সঙ্গে গল্প করতাম। আমারও তো ঘুম আসছিল না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। একটু হাসিও পেল। এই রকমই হয়, কোন জিনিসই ঠিক ঠিক মেলে না! যাক ভালোই হয়েছে!

আমি বললাম, সে তো কাল রাত্তিরের কথা। সে কথা হঠাৎ এখন কেন? এখন আমরা কী করব, তাই ঠিক করতে হবে। এই জায়গার সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে আমি জানি, কোন নতুন লোকের পক্ষে এখানে আত্মগোপন করে থাকা এমনকি সাধু সেজে থাকাও, বেশিদিন সম্ভব নয়। এখানকার জঙ্গলে ফলমূল পাওয়া যায় না। পাহাড়ের ওপর শুধু পাইন আর পপলার গাছ। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে কারুকে লোকালয়ে আসতেই হবে। তখনই তার কথা জানাজানি হয়ে যাবে।

—যদি পাহাড়ের ওপর ছোট্ট কোন গ্রামে গিয়েই সে থাকে, কে তার কথা এখানে জানবে?

—গভর্নমেণ্ট থেকে যখন খোঁজ করা হয়েছে, তখন জানা যেতই।

—তবু আমি নিজে একবার খোঁজ নিতে চাই।

—বেশ তো ভালো কথা।

—তুমি আজ ফিরে যেতে চাও?

—আর তুমি পাহাড়ী রাস্তায় বুলবুলকে নিয়ে একা যাবে? আমাকে কি এতটা স্বার্থপর মনে হয়?

—না, স্বার্থপর আমিই। আচ্ছা, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি। লোকে তো কাশ্মীরে সাধারণত একবারই আসে। তুমি দু'বার এসেছ কেন?

—এর একটা কারণ আছে। ছেলেবেলায়, তখন আমি স্কুলে পড়ি, বোধহয় ক্লাস নাইনে, আমাদের স্কুল থেকে কিছু ছাত্রকে কাশ্মীরে বেড়াতে আনা

হয়েছিল—আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এসেছিল, কিন্তু আমার বাবা আমাকে আসতে দেননি। ঠিক যে টাকা পয়সার অভাবের জন্য, তা নয়, তিনি আমাকে একা ছাড়তে চাননি। বন্ধুদের কাছে আমার কতটা অপমান হয়েছিল, ভাবো? কান্নাকাটি করেছি, না খেয়ে থেকেছি, তবু বাবা রাজি হননি। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বড় হয়ে নিজে যখন টাকা রোজগার করব, তখন বার বার কাশ্মীরে যাব। এই তো সবে দু'বার হলো, আরো অনেকবার আসব।

—বাবাঃ! তুমিও তো দেখছি কম জেদী নও!

এই সময় বুলবুল ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। আমার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, কাকু তুমি যে বলেছিলে, আমাকে সত্যিকারের ঘোড়ায় চড়াবে? চড়ালে না?

আমি বললাম, হ্যাঁ, চড়াব। চলো!

শুভ্রাকে ইশারা করলাম উঠে পড়তে। আমরা এগিয়ে গেলাম ব্রীজের দিকে। খটাখট শব্দে অনেক তাঁবুর খুঁটি ওপড়ানো শুরু হয়ে গেছে। জনস্রোত চলেছে শহরের বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। সবাই ফেরার জন্য ব্যস্ত।

ব্রীজের কাছে এসে আমি নিম্নস্বরে বললাম, তুমি একটু বুলবুলকে নিয়ে একা থাকো, আমি একটু এগোচ্ছি। কমলেশ চ্যাটার্জির ছবিটা আমাকে একটু দাও তো।

শুভ্রা হাত-ব্যাগ থেকে ছবিটা বার করল। সুট টাই পরা কমলেশ চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওঁর জন্য আমার দুঃখ হলো। নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু চাওয়ার ও পাওয়ার ছিল এই মানুষটির।

ছবিটা হাতে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম ঢালু জায়গাটার দিকে। এখান থেকে রাস্তাটা উঁচু হয়ে শহরে উঠেছে। এখানে ঘোড়াওয়ালারা সবাই দাঁড়িয়ে থাকে। আরু কিংবা কাছাকাছি দু একটা জায়গায় অনেক লোক এই সময়েও ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে যায়। আজ অবশ্য এদিকে যাত্রী একদম নেই।

আমি ঘোড়াওয়ালাদের জনে জনে সেই ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, এই লোকটিকে কেউ দেখেছে কিনা। না, ওরা কেউ দেখেনি। গভর্নমেণ্টের লোকও ওদের এই লোকটির কথা জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি আরো জানতে চাইলাম, এখন অমরনাথ যাওয়া কোনোক্রমে সম্ভব কিনা। ওরা সবাই একবাক্যে জানাল, সে প্রশ্নই ওঠে না। তবে ঘোড়া নিয়ে ঐ রাস্তায় চন্দনবাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যেতে পারে—কিন্তু রাস্তায় এখনো অনেক জায়গায় বরফ। আর চন্দনবাড়ির ঠিক পরেই এমন বিশাল বরফের ঢল নেমে থাকে যা পেরুনো অসম্ভব বলা চলে।

'তিন সপ্তাহ আগে এই রাস্তায় আরো বেশি বরফ ছিল। সেই সময়, ঘোড়া

না নিয়ে, পায়ে হেঁটে কমলেশ চ্যাটার্জি ঐ দিকে যেতে চাইবে? যদি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়ে থাকে তো সে আলাদা কথা। আর অসম্ভবকে সম্ভব করে অমরনাথে পৌঁছেই বা তাঁর লাভ কী? সেই বরফের শিবলিঙ্গ তো এখন দেখা যাবে না। এখন তো সেখানে সবই বরফ—এখানকার বরফ আর সেখানকার বরফে কোনো তফাত তো নেই। কমলেশ চ্যাটার্জি কি এমনই কাণ্ডজ্ঞান হারাবে?

সব কথা ফিরে এসে শুভ্রাকে জানাতেই সে বলল, আমি তা হলে অন্তত চন্দনবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে দেখব।

আমি বুঝে গেছি যে এই জেদী নারীকে কিছুতেই নিরুদ্যম করা যাবে না। চন্দনবাড়ি পর্যন্তই যাওয়া যাক। সেখানে গিয়ে সে নিজের চোখে দেখুক যে আর সামনে এগোবার পথ নেই।

দুটো ঘোড়া ভাড়া করলাম। বুলবুল আলাদা একটা ঘোড়ায় চড়তে চায় সে অন্য কারুর সঙ্গে যাবে না। কিন্তু ওর জন্য আলাদা একটা ঘোড়া নেবার কোনই মানে হয় না। প্রথম কিছুটা পথ বুলবুলকে আমার ঘোড়ায় চাপিয়ে আমি হেঁটে হেঁটে গেলাম পাশে পাশে। ঘোড়াওয়ালা দুটোই প্রায় বাচ্চা ছেলে, তারা বুলবুলকে ধরে রইল। শুভ্রাকে ধরবার দরকার নেই, তার ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস আছে মনে হয়। ঘোড়ার ওপর তার ঋজু হয়ে বসে থাকা মূর্তি, প্রায় কোনো রাজেন্দ্রাণীর মতন দেখায়।

আমি ঘোড়ায় চেপে বিশেষ আরাম পাই না। অভ্যেস নেই বলে ভয় ভয় করে। এখানকার ঘোড়াগুলো অবশ্য ছোটো ছোটো আর এমনই শিক্ষাপ্রাপ্ত যে কিছুতেই দৌড়োয় না, শুধু হাঁটি হাঁটি পা পা করে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ঘোড়াওয়ালাগুলো ওদের গায়ে ছপটি মারলে এমন তড়বড় শুরু করে যে তখন বিচ্ছিরি লাগে। আর এই ঘোড়াগুলোর একটা দোষ, এরা একেবারে খাদের ধার ঘেঁষে ঘাস খাওয়ার জন্য মুখ বাড়ায়। তখন যে পিঠে একটা সওয়ারি আছে, সে কথা ভুলে যায় ওরা। সেই সময় খাদের মধ্যে একবার হুমড়ি খেয়ে পড়লেই একেবারে ঢাকী সুদ্ধু প্রতিমা বিসর্জন।

সমতল ছেড়ে রাস্তাটা পাহাড়ে উঠেছে। এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে দশ মাইল পথ, তারপর চন্দনবাড়ি। খানিকটা দূর যাবার পরই বিশাল বিশাল পাহাড় গোল হয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। প্রতিটি পাহাড়ের মাথায় বরফের মুকুট। না, মুকুট বলা চলে না, বলা উচিত বরফের রাজপ্রাসাদ। প্রত্যেকের আলাদা রূপ।

লিদ্দার নদী আমাদের পাশে পাশে ঠিক চলেছে। এক এক সময় সে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়, আবার একটু বাদেই ফিরে আসে। বেশ কিছুক্ষণ সে ছিল আমাদের খুব কাছাকাছি, এখন চলে গেছে পাহাড়ের অনেক নীচে—কোথাও সে

জলপ্রপাত হয়ে বিপুল শব্দে নীচে লাফাচ্ছে, কোথাও তার ওপর নুয়ে পড়েছে বড় বড় গাছ। প্রায়ই সে এদিক ওদিকের পাড় ভাঙে। বুলবুল ওর মায়ের ঘোড়ায়। আমার ঘোড়াটি তার পাশে পাশেই যাচ্ছে।

আমাদের পথ ক্রমশ ওপরে উঠে আসছে। বুলবুলকে এখন তুলে দিয়েছি ওর মায়ের ঘোড়ায়। আমার ঘোড়াটি তার পাশে পাশেই যাচ্ছে। কখনো কখনো ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে যাচ্ছে গায়ে গায়ে। ঘোড়াগুলো এত বেতরিবৎ যে লাগাম টানলেও অন্যদিকে যায় না। ওরা শুধু মালিকের কথা ছাড়া আর কারুর কথা শোনে না। বুলবুল এতে বেশ মজা পাচ্ছে, কাছাকাছি এলেই সে চেঁচিয়ে উঠছে, আমরা ফার্স্ট হবো, আমরা ফার্স্ট মা, তুমি আগে চলো!

বেশ কিছুদূর আসবার পর এক জায়গায় কাঠের খটাখট শব্দ পেলাম। একটা বাঁক ঘুরতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। নতুন কাঠ দিয়ে একটা ব্রীজ সারানো হচ্ছে। ঘোড়াওয়ালাদের কাছে শুনলাম, পাহাড় থেকে ধ্বস নেমে ব্রীজটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল, মাত্র তিনদিন হলো এটাকে ঠিক করা হয়েছে। এর আগে বেশ কিছু দিন কেউ এদিক থেকে ওদিকে যেতে পারেনি।

ব্রীজটার তলায় একটি চওড়া ঝরনা। ছোটোখাটো জলপ্রপাত বলা যায়। কারুর পক্ষে পায়ে হেঁটে সেটা পেরুনো অসম্ভব।

আমি শুভ্রার মুখের দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টি দিয়ে তাকে বোঝাতে চাইলাম, কমলেশ চ্যাটার্জি এদিকে এসে থাকলেও ওপারে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

শুভ্রা কোন কথা বলল না, সে গম্ভীরভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

ব্রীজটা পেরিয়ে যাবার খানিকটা পরেই একটা ছোট্ট লোকালয় এল। সেখানে একটি চায়ের দোকান আছে। অন্যরকম পানীয়ও পাওয়া যায়। সেখানে নেমে পড়লাম ঘোড়া থেকে।

দোকানের মধ্যে ঢুকে আমি কমলেশ চ্যাটার্জির ছবিটা দেখালাম। না, ঐ লোককে সে দেখেনি। এ দিক দিয়ে কি এর মধ্যে কোন লোকই যায়নি? হ্যাঁ গেছে, সাহেবরা গেছে, আর দেশী লোক দু' চারজন। ব্রীজটা ভাঙবার আগে কিছু লোক গেছে।

এদিকে কোন নতুন সাধু এসেছে?

না।

কোন বাঙালিবাবু এদিকে একা এসে আছে?

না। গভর্নমেন্টের লোকও তাকে এই কথাই জিজ্ঞেস করেছিল কিছুদিন আগে। শখের গোয়েন্দারা অনেক রকম চমকপ্রদ উপায় বার করে। কিন্তু আমার

সেদিকে কোন প্রতিভা নেই। আমার বদলে, শুভ্রা চ্যাটার্জি কোন গোয়েন্দার সাহায্য নিলে পারতেন।

দেখা যাচ্ছে, গভর্নমেণ্ট অনুসৃত পন্থার চেয়ে নতুন কিছু করতে পারছি না আমরা।

এ দোকানে এখন এক কাপ চায়ের দাম এক টাকা। কাপে করে চা দেয় না অবশ্য, দেয় গেলাস ভর্তি করে। সেই গরম চা ভর্তি গেলাসটা দু' হাত দিয়ে ধরে থাকলেই বেশ আরাম লাগে। গেলাসের মধ্যের জিনিসটাকে অবশ্য চা বলা শক্ত, খাঁটি ভেড়ার দুধে একটা বুনো পাতার গন্ধ। তাও খেতে খারাপ লাগে না।

ঘোড়াওয়ালারা তাড়া দিচ্ছে। ওরা চন্দনবাড়িতে থাকবে না, আজই ফিরে আসবে। আমাদের বেরুতে বেশ দেরি হয়ে গেছে—ফেরার সময় যদি অন্ধকার হয়ে যায়, তা হলে খুব মুশকিল হবে ওদের। মাঝে মাঝে রাস্তা খুব খারাপ।

সেখান থেকে বেরুবার পর প্রকৃতি আরো নিবিড় হয়ে এল। চারদিকে শুধু পাহাড়, তার মধ্যে আমরা মাত্র কয়েকটা বিন্দু। এখানে এলে মনটা এমনিতেই ভারী হয়ে আসে। কমলেশ চ্যাটার্জিকে খোঁজার উপলক্ষে হলেও এ রাস্তায় আমি দ্বিতীয়বার এসে ভুল করিনি। না এলেই ভুল করতাম। শুভ্রাকে আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। কারণ এর আগেই একবার সে বলেছিল যে কাশ্মীরে সে দৃশ্য দেখতে আসেনি। প্রকৃতি দেখার দিকে এখন তার মন নেই।

এই রাস্তাটা এখন ফাঁকা হলেও দু'এক সপ্তাহের মধ্যে পর্যটকের ভিড়ে ভরে যাবে। পহলগাম থেকে অনেকেই চন্দনবাড়ি পর্যন্ত বেড়াতে আসে ঘোড়া নিয়ে। তারপর জুলাই মাস থেকেই তীর্থযাত্রীদের অগণন শোভাযাত্রা। এর চেয়ে ঢের দুর্গম পাহাড়ী পথ আছে, পর্বত অভিযাত্রীরা আরো কত বিপদের মধ্য দিয়ে যায়—কিন্তু তবুও অস্বীকার করা যাবে না, পহলগাম থেকে চন্দনবাড়ির পথের দৃশ্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৃশ্যাবলীর একটি।

মাঝে মাঝেই মেঘ নীচু হয়ে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে দু'এক পশলা। ভিজতেই হচ্ছে, কোন উপায় নেই। রাস্তার এক-একটা জায়গা এমন ফাকা যে কাছাকাছি কোন গাছও নেই যে দাঁড়াব। রেইন কোট আর শেষ পর্যন্ত আমার কেনা হয়নি। শুভ্রার সঙ্গে একটা রেইন কোট আছে, সেটা দিয়ে সে বুলবুলকে সুদ্ধু ঢেকে নিয়েছে।

শুভ্রা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি এরকম বৃষ্টিতে কতক্ষণ ভিজবে?

আমি হেসে বললাম, উপায় কি? আর তো কিছু করার নেই।

ও বলল, তারপর তোমার যদি ঠাণ্ডা বসে যায়!

—না, কিছু হবে না। রোদ্দুর উঠলেই তো শুকিয়ে যাচ্ছে।

—আমার খুব খারাপ লাগছে। একটা কোন গাছতলা এলেই আমরা দাঁড়াব।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়াব ? পাহাড়ের ওপর তো মাঝে মাঝে বৃষ্টি হবেই এ সময়।

একজন ঘোড়াওয়ালা একটা ব্যবস্থা করে দিল। ওরা দু'জন অনর্গল ভিজছে, ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এতখানি রাস্তা ওরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে আসছে তো বটে। এই পাহাড়ে আমরা এক শো গজ দৌড়লেই হাঁপিয়ে যেতাম। ওদের একজন তার ঘোড়ার জিনের তলা থেকে এক টুকরো তেরপল টেনে বার করল। সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল, সাব, এটা মাথায় জড়িয়ে নিন।

সেই তেরপল গায় মাথায় জড়িয়ে আমার এক কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হলো। বুলবুল আমাকে দেখে খিলখিল করে হাসতে লাগল। শুভ্রাও হাসি চাপতে পারছে না।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে আমরা প্রথম হিমবাহের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। প্রায় দু' তিনশো গজ জুড়ে বিশাল এক হিমবাহ নেমে গেছে পথের ওপর দিয়ে। অনেক নীচে লিদ্দার নদী।

কেউ কোদাল দিয়ে বরফের খানিকটা কেটে কেটে একটা রাস্তা বানাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওপর থেকে আবার বরফ গলে গলে সে রাস্তা প্রায় বুজে গেছে। তবু রাস্তার আভাস দেখা যায়।

এর ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া অসম্ভব। কোথাও বরফ সামান্য পাতলা থাকলে আর দেখতে হবে না। ঘোড়াওয়ালারা বলল, ওরা আগে ঘোড়া দুটোকে নিয়ে যাবে। ঘোড়ারা তাদের অনুভূতি দিয়ে বোঝে যে কোনখান দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। ঘোড়াগুলোকে পার করে রেখে এসে তারপর সেই পথ দিয়ে ওরা আমাদের হাত ধরে ধরে নিয়ে যাবে।

ওরা ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যেতে লাগল, আমরা একটা পাথরের ওপর বসলাম। বুলবুলের খিদে পেয়েছে, তাকে দেওয়া হলো বিস্কুট আর টফি। এতক্ষণ ঘোড়ার ওপর বসে থেকে আমার হাতে এবং সারা গায়ে একটা ঘোড়া ঘোড়া গন্ধ হয়ে গেছে।

শুভ্রা মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চার দিকটা দেখছে। চতুর্দিকের পর্বত শৃঙ্গগুলিও যেন দেখছে আমাদের। নির্জনতা এখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

যে দিক থেকে হিমবাহটি নেমেছে, সেই গিরিচূড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে শুভ্রা জিজ্ঞেস করল, এটার নাম কী ?

আমি বললাম, সবগুলো শিখরের নাম তো জানি না। এখানকার লোকেও জানে কিনা সন্দেহ। তবে ডান দিকের কোণে ঐ যে পাহাড়টা মাথা উঁচু করে আছে, ঐটাই শেষনাগ। ওর গা দিয়ে অমরনাথে যেতে হয়। লিদ্দার নদী ঐখান থেকে এসেছে।

শুভ্রা বলল, এখানে এলে মনে হয় না, মানুষের দুঃখ কত ছোট ? এত বিরাট জিনিস দেখলে দেবতা কিংবা ঈশ্বরের কথা মানতে ইচ্ছে হয়। এই সব কিছুর মধ্যে একটা অদ্ভুত শান্তি আছে—এর তুলনায় আমাদের দুঃখগুলো কত সামান্য। এখন যেন বুঝতে পারছি, কোনো আকর্ষণে মানুষ এখানে এসে থাকতে চায়...আরো একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লাগছে, তিনদিন আগে তোমাকে চিনতামও না, অথচ আজ এই পাহাড়ের কোলে একটা পাথরের ওপরে আমরা বসে আছি, যেন আগে থেকেই এটা আমাদের নিয়তিতে নির্দিষ্ট করা ছিল, অথচ আগে কখনো ভাবিইনি, তোমার আশ্চর্য লাগছে না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে পথে বেরিয়ে তো মানুষের সঙ্গে এরকম দেখা হয়ই !

শুভ্রা বলল, পথে...হ্যাঁ পথে বেরিয়েই তো...সবার সঙ্গে তো পথেই দেখা, একমাত্র নিজের মা ছাড়া মানুষ তো আর সবাইকে পথে বেরিয়েই চেনে...

—তাও সবার সঙ্গে পুরোপুরি চেনাশুনো হয় না। দেখা হয়, কিন্তু চেনা হয় না। যেমন তোমাকে আমি এখনো চিনতে পারিনি।

—আমি তো সামান্য একটি মেয়ে, আমার মধ্যে তো না-চেনার কিছু নেই।

—তবু কাল রাত্রে তোমাকে মনে হচ্ছিল অনেক দূরের কেউ, বহুদূরের, তোমাকে ছোঁওয়া যায় না।

শুভ্রা আর কোন কথা না বলে আমার হাতের ওপর একটা হাত রাখল। তখন আমার মনে হলো এ রকম একটু স্পর্শে মানুষ কত কাছাকাছি চলে আসে। কত স্বাভাবিক হওয়া যায়। বুকের মধ্যে আর ভার ভার ভাবটা নেই।

পাতলা মেঘগুলো ধোঁয়ার মতন উড়ছে। এক এক সময় চোখের সামনে থেকে সমস্ত পাহাড় আড়াল হয়ে যায়, আবার সরে যায় মেঘ। সব মিলিয়ে এই নিসর্গের মধ্যেও যেন অনৈসর্গিক কোন উপলব্ধি আসে। মানুষ তো এত বিরাটের কাছাকাছি খুব বেশি আসে না, তাই এরকম জায়গায়, মুগ্ধতার চেয়ে বেশি এক ধরনের আবিষ্টতা তাকে পেয়ে বসে। তার নামই বোধহয় সন্ন্যাস।

শুভ্রা একদৃষ্টে সেই ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ দেখছে। সে বলেছিল, এবার তার প্রকৃতি দেখার মন নেই। কিন্তু এখন সে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

সে আবার আস্তে আস্তে বলল, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই জায়গাটার খুব কাছেই স্বর্গ, এই পাহাড়গুলো যেন সেখানে যাবার সিঁড়ি—এই যে মেঘ, ঠিক ধূপের ধোঁয়ার মতন, মনটা এমন শান্ত হয়ে আসছে...সত্যি এসব জায়গা থেকে ফিরতে ইচ্ছে করে না—

আমি একটা সিগারেট ধরালাম। ঘোড়াগুলো খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে এইমাত্র অন্যদিকে পৌঁছোলো। এবার ছেলে দুটি ফিরে আসছে। পা পিছলে যাবার ভয়ে ওরা ওদের হাতের ছপটি দিয়ে ভর রাখছে বরফের ওপর। আমাদেরও সঙ্গে একটা করে লাঠি থাকলে হতো। কাছাকাছি সে রকম কোনো গাছ নেই যে ভেঙে নেওয়া যায়। আমি গাছ খোঁজবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মা বলে একটা চিৎকার শুনলাম। তারপরই শুভ্রার আর্তনাদ, বুলবুল !

একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে আমরা বুলবুলকে দেখিনি। সে নিজের খাবার ফেলে একটা ফড়িং ধরবার জন্য ছুটে গিয়েছিল। এখন সে বরফের ওপর গড়াচ্ছে। শুভ্রা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে ধরবার জন্য ছুটল।

আমি বুলবুলকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা না করে কোনোরকমে শুভ্রার একটা হাত চেপে ধরবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না নিজেও তাল সামলাতে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উল্টো দিকে ফিরে একটা পাথর চেপে ধরলাম। আমার ধাক্কায় শুভ্রা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে একটা ঘোড়াওয়ালা ছুটে এসে শুভ্রাকে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরেছে। অন্য ঘোড়াওয়ালাটি হিমবাহের ওপর দিয়েই কোনাকুনি ছুটে গিয়ে বুলবুলকে পেরিয়ে গেল, তারপর বরফে পা গেঁথে দাঁড়িয়ে, বুলবুল গড়িয়ে তার কাছে আসতেই বুকে জড়িয়ে ধরল।

শুভ্রা ঘোড়াওয়ালাটিকে ঠেলে সরিয়ে উঠে বসে পাগলের মতন চ্যাঁচাতে লাগলো, বুলবুল, বুলবুল !

আমি এবার সাবধানে ওর কাছে গিয়ে বললাম, সব ঠিক আছে, ঐ তো বুলবুলকে নিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছ না?

শুভ্রা তখনও বুঝতে পারেনি কেন আমি ওকে ধাক্কা দিয়েছি, কেন একজন ঘোড়াওয়ালা ওকে মাটির ওপর চেপে ধরেছিল। ঘোড়াওয়ালাটাই তাকে বুঝিয়ে দিল। সে ঝাঁঝালো ভাষায় শুভ্রাকে ধমকাতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে ! মাইজী কি বাচ্চা, কিছুই জানেন না ? পাহাড়ে কেউ নীচের দিকে দৌড়োয় ? এতে ঐ লেড়কি শুধু নয়, মাইজীও মরতেন।

বুলবুলের হালকা শরীর, সে কয়েক পাক গড়িয়ে গেলেও তার লাগেনি বিশেষ। কিন্তু বয়স্কদের ভারী শরীর একবার গড়াতে শুরু করলে আর থামে না। পাহাড়ে অনভিজ্ঞ হয়ে যে অন্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, সে-ই আগে মরে। বরফ এখন শক্ত আর পিচ্ছিল হয়ে আছে, হাত দিয়ে ভাঙা যায় না পর্যন্ত। প্রায় আধ মাইল নীচে নদী। সেই পর্যন্ত গড়িয়ে পড়লে শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।

শুভ্রার এখনো ঘোর কাটেনি। বুলবুলকে সে হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে নীচেই

বসে রইল, উঠতে পারছে না। বিহ্বলের মতন বলল, বুলবুল যদি মরে যেত, তাহলে আমি কী করতাম?

—এমন দুরন্ত মেয়ে, একটুও চোখের আড়াল করার উপায় নেই।

—যদি বুলবুলের কিছু হতো, তা হলে আমি কী করতাম বলো না? তাহলে তো আমার বেঁচে থাকবার কোন মানেই থাকত না।

আমি বললাম, কিছু তো হয়নি! উঠে পড়ো! পাহাড়ে এরকম প্রায় মরে যাবার মতন ঘটনা অনেকবার হয়। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

শুভ্রা তবু বুলবুলের মাথায় হাত বুলোচ্ছে। চুলগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছে, যদি কোথাও লেগে থাকে!

আমি বললাম, কী বুলবুল, কেমন লাগল? বেশ গড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে—

বুলবুল বলল, আমার একটুও লাগেনি।

—আর একবার যাবে নাকি?

—হ্যাঁ যাবো!

—এসো, এবার আমরাই তোমাকে ফেলে গড়িয়ে দিই!

ঘোড়াওয়ালাদের হাত ধরে ধরে আমরা হিমবাহটা পার হলাম। নীচের দিকে তাকালে বুক দুরদুর করে। খানিকটা ঢালু হয়ে যাবার পর একদম খাড়াভাবে নেমে গেছে নদীতে। সেখানে লিদ্দারের জল ফুলে ফেঁপে লাফাচ্ছে একেবারে। জলের মধ্যে সাদা সাদা বরফের চাঁই ভাসতে দেখা যাচ্ছে।

আবার ঘোড়ায় উঠলাম এপারে এসে। কিছুটা যাবার পর আরো দু'বার বরফ পাওয়া গেল পথে। তবে আগেকার মতন ঢালু জায়গা নয়, প্রায় সমতল, বরফও বেশ নরম, অনেকটা প্যাচপেচে কাদার মতন। এখানেও আমরা কিছুক্ষণ থেমে বুলবুলকে বরফের ওপর খেলা করতে দিলাম। মুঠো-মুঠো বরফ তুলে গোল্লা পাকিয়ে সে আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে। ঠিক বরফের ওপর এলে শীত তেমন বেশি লাগে না। গায়ে বরফ পড়লেও জামা কাপড় ভেজে না।

আর এক জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে খানিকটা হাঁটতে হলো। এখানে বরফ নেই, কিন্তু রাস্তার মাঝখানটা ভেঙে বসে গেছে। সেখান দিয়ে ঘোড়া পার করার উপায় নেই। খানিকটা পিছিয়ে এসে খাড়া পাহাড়ের ওপর উঠতে হলো, বুলবুল অবশ্য বসে রইল একটা ঘোড়ার পিঠে, আমি আর শুভ্রা হাঁটতে লাগলাম। জায়গাটা ছোট ছোট আলগা পাথরে ভর্তি। খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। শুভ্রা নিজে থেকেই আমার একটা হাত চেপে ধরল। খুব শক্ত করে। দু'জনে ধরে ধরে উঠলে ব্যালান্স হারাবার ভয় কম থাকে।

শুভ্রা বলল, সবাই কি এত কষ্ট করে এই পথ দিয়ে যায়?

—আগেকার তীর্থযাত্রীদের নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি কষ্ট হতো। তখন তো এরকম রাস্তাও ছিল না। তবে, আর দু'এক সপ্তাহ পরে টুরিস্ট সিজন শুরু হয়ে গেলে, এইসব ভাঙা রাস্তাও ঠিকঠাক হয়ে যাবে, তখন এত কষ্ট হবে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ যখন এ পথ দিয়ে যান, তখন তাঁর শরীর ভালো ছিল না। শেষের দিকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মনের জোর তো ছিল অসাধারণ, অমরনাথের গুহায় ঢোকার সময় নদীতে স্নান করেছিলেন!

—তুমি তো বিবেকানন্দ সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো করেছ।

—কমলেশ পড়ত খুব—ওর মুখেই শুনতাম। কিন্তু একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছ? এইসব রাস্তায় যতই কষ্ট হোক, কক্ষনো ইচ্ছে করে না ফিরে যেতে।

—তা ঠিক। কেউ বোধহয় মাঝ পথ থেকে ফিরে যায় না।

—আচ্ছা, এরকম কষ্ট করে, কিংবা এর চেয়েও হয়তো বেশি কষ্ট হবে—তবু কেউ এই সময় অমরনাথ যেতে পারে না?

—চন্দনবাড়িতে গিয়েই সেটা বোঝা যাবে।

চন্দনবাড়িতে পৌঁছতে প্রায় দুটো বাজল। আগেরবার এসে দেখেছিলাম, এখানে তিন চারটে খাবারের দোকান আর কয়েকটা চটি ছিল। এখন যাত্রী সমাগম নেই বলে, কোনটাই খোলা নেই। আমাদের সঙ্গে অবশ্য পাঁউরুটি আর জেলি আছে। তবু এক চটিওয়ালাকে ধরে গরম ভাত আর ভিণ্ডির সবজি তৈরি করে দিতে রাজি করালাম। একটা পাকা টুরিস্ট বাংলোও তৈরি হয়েছে, নেহাৎ রাত্রে থাকতে হলে ওখানে ঘর পাওয়া যাবে।

খাওয়া-দাওয়ার আগেই শুভ্রা সামনের রাস্তাটা আর একটু এগিয়ে দেখতে চায়। ঘোড়াওয়ালা থেকে সবাই বলল যে, একটু পর থেকেই রাস্তা একেবারে বন্ধ, এই সময় অমরনাথে কেউ যায় না। সেখানে কোন মানুষজনও থাকে না। দু'একজন সাধু থাকে অবশ্য। সেইসব সাধুরা কী ভাবে যায়, কী তারা খায়, তা বলতে পারবে না কেউ।

শুভ্রা আর বুলবুলকে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। বেশি দূর যেতে হলো না। চন্দনবাড়ি একটা ছোট্ট উপত্যকা, দু'তিন শো গজ যেতেই আবার পাহাড়ের দেশ। প্রথমেই একটা নিকষ কালো রঙের শক্ত চেহারার বরফহীন পাহাড় খাড়া হয়ে আছে, সেটা যেন অমরাবতীর সিংহদ্বার। সেটার পাশ দিয়ে আসতেই সামনে জেগে উঠল এক ধবল দেশ। যতদূর চোখ যায়, শুধু বরফ। সামনের দিকের সমস্ত পাহাড় থেকে নেমে এসেছে এক বিরাট মহিমময় বরফের ঢল। ওপরের দিকে তাকালে মনে হয়, সেই হিমবাহ যেন নেমে এসেছে আকাশ থেকে। হতে

পারে এটা একটা সিঁড়ি, কিন্তু এ সিঁড়ি মানুষের জন্য নয়।

জুন জুলাই মাসে এখানকার পথের বরফ অনেক গলে যায়! কিন্তু চন্দনবাড়ির এই হিমবাহ কখনো সম্পূর্ণ গলে না, তীর্থযাত্রীদের এই বরফের ওপর দিয়েই যেতে হয়। যুগ যুগান্ত ধরে এই বরফ এখানে রয়েছে।

যে লিদ্দার নদী সারা রাস্তা আমাদের পাশে পাশে আসছিল, এখান থেকে সে ঢুকে গেছে ঐ হিমবাহের নীচে। এর পর থেকে সে অদৃশ্য। স্পষ্ট দেখা যায় লিদ্দার নদীর ওপর ঝুঁকে পড়েছে একটা বরফের দেয়াল, তার তলা দিয়ে নেমেছে অবিকল স্তম্ভের মতন মোটা মোটা বরফের চাঁই।

আমরা স্তম্ভিতভাবে সেই হিমবাহের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন ধর্মোন্মাদ হয়তো প্রতি মুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দিনের পর দিন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এটা পার হবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে যে আর এগোনো সম্ভব নয় সে কথা শুভ্রাকে বোঝাতে হলো না। সে বুঝে গেছে।

হিমবাহের যে-দিকটা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, তার কাছাকাছি খানিকটা অংশ তেমন ঢালু নয়—সেখানে ছড়িয়ে আছে চূর্ণ বরফ। সেখানে স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছে, বরফ দিয়ে দিয়ে তারা তৈরি করেছে একটা দানবের মূর্তি।

বুলবুল বলল, নীলুকাকু, আমি ঐখানটায় একটু যাব?

সেখানে কোন বিপদের ভয় নেই বলে বললাম, যাও, কিন্তু এক্ষুনি আসবে, বেশি দেরি করবে না।

শুভ্রা বলল, চলো, নদীটা কী করে বরফের নীচে ঢুকল, একটু দেখে আসি।

এখান থেকে একেবারে খাড়া নীচে নদীটাকে দেখা যায়। হিমবাহের নীচে অন্ধকার গহ্বরে সে ঢুকে গেছে। অদ্ভুত দৃশ্য ঠিকই।

নদীর দিকে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি। এমন সময় শুভ্রা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চক্ষু দুটি স্থির। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি তাকালাম।

নদীর ধারে একটা চৌকো পাথরের ওপর জোড়াসনে বসে আছে একজন মানুষ। সামনের পাহাড়ের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে। গায়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি, মাথার চুলও সাধারণ মানুষের মতন। কিন্তু লোকটিকে এমনই ধ্যানমগ্ন মনে হয়, যেন শরীরটি পাথরের মূর্তির মতন অনড়।

এই কি কমলেশ চ্যাটার্জি? আমার চকিতে মনে পড়ল, ছবিটা তো এখানকার লোকজনকে দেখানো হয়নি! দু'একটি চটির বারান্দায় কাচা শার্ট প্যান্ট ঝুলতে দেখেছি। তার মানে বাইরের মানুষ দু'একজন আছে এখানে। তাহলে এই কমলেশ

চ্যাটার্জি ? উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল। সেই সঙ্গে একটা আরামও বোধ করলাম। যে-কোন জিনিসই খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলে এইরকম আরাম হয়।

শুভ্রা ফিসফিস করে বলল, আমি যাব না।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ? কী হয়েছে ? ইনিই কি কমলেশ ?

—জানি না ! হোক বা না হোক। আমি যেতে চাই না ওখানে !

—কেন ?

—চুপ, চলো আমরা ফিরে যাই !

—সেকি ! ঠিক আছে, আমি গিয়ে ওঁকে ডেকে আনছি !

—না !

শুভ্রা আমার হাতটা চেপে ধরল শক্ত ভাবে। বুঝতে পারলাম, ও কাঁপছে থরথর করে ! উত্তেজনায় ওর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আমায় মিনতি করে বলল, প্লিজ, ও যেন আমাকে দেখতে না পায়, আমি এক্ষুনি চলে যাব !

—এরকম করছ কেন, শুভ্রা ! এতদূর এসে—

—আমি ওকে আর বিরক্ত করতে চাই না। কী রকমভাবে বসে আছে, দেখছ না ? একেবারে তন্ময় হয়ে আছে। এই রকম পাহাড়ের দিকে চেয়ে বসে থাকা...এই জীবন যদি ওর এত ভালো লাগে, তাতে আমি কেন ব্যাঘাত করব ? আমি শুধু ওর স্ত্রী বলে ? আমি কি এত স্বার্থপর ? আমি কি ওর বন্ধন ? কেন, আমিও তো একলা বাঁচতে পারি—

—ঠিক আছে, একবার দেখা করে আসা যাক অন্তত !

—না, তা হয় না। আমাদের দেখলে ও দুর্বল হয়ে যাবে ! বুলবুলকে দেখলে...কেন আমি ওকে ঘরে ফেরাব, যদি ঘর ওর ভালো না লাগে ? আমার কি অধিকার আছে ? আমি ভুল করেছিলাম, আমার মেনে নেওয়া উচিত ছিল...পাহাড়ের দিকে চুপ করে চেয়ে বসে থাকলে একজন মানুষকে যে এত ভালো দেখায়, তা কি আমি আগে জানতাম ? বুলবুলকে আমি একাই মানুষ করতে পারব...চলো।

—আমাকে তো উনি চেনেন না, আমি অন্তত একবার পাশ থেকে দেখে আসি।

—না, দরকার নেই, আমি জানতে চাই না, আমার খোঁজা শেষ হয়ে গেছে। আমি মনে মনে উত্তর পেয়ে গেছি, প্লীজ, চলো—

শুভ্রা আমার হাত ধরে জোর করে টানল। আমি, ঠিক কী করা উচিত বুঝতে পারলাম না।

—কিন্তু এত দূর এসেও একবার অন্তত দেখা না করে চলে যাব আমরা?

—চুপ। এখানকার শান্তি নষ্ট করো না—চারপাশটা কী অপরূপ সুন্দর, এখানে সামান্য স্বার্থ, মানুষে মানুষে সম্পর্ক এসবের যেন কোন মানে নেই। আমি বুঝতে পেরেছি, আমার খোঁজা শেষ হয়ে গেছে, ফিরে চলো—

বুলবুল কখন আমাদের কাছে ফিরে এসেছে টের পাইনি। সে বলল, মা, ওখানে কে বসে আছে?

শুভ্রা বলল, কেউ না!

বুলবুল তবু বলল, বাপীর মতন দেখতে। বাপীকে ডাকছ না কেন?

—না, বাপী নয়। চলো, আমরা এক্ষুনি যাব।

—আমি দেখে আসি তো বাপী কিনা—

বাপী বলে চিৎকার করে ডেকে বুলবুল সেই দিকে দৌড়োল! শুভ্রা হাত বাড়িয়েও মেয়েকে ধরতে পারল না। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলাম। শুভ্রা পেছন ফিরে দৌড়ে চলে যেতে চাইল, এবার আমিই তার হাত ধরে রাখলাম শক্ত করে।

লোকটির কাছাকাছি গিয়ে বুলবুল একটি আছাড় খেল। তার বেশ লেগেছে। লোকটি সেই শব্দে পেছন ফিরে তাকাল। তাড়াতাড়ি উঠে বুলবুলকে তুলে নিল কোলে। তাকিয়ে দেখল আমাদের দিকে। তারপর বুলবুলের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

সংকট মুহূর্তেই এরকম ভুল হয়। লোকটি কমলেশ চ্যাটার্জি নয়। একজন সৌম্য চেহারার অবাঙালি ভদ্রলোক। পাঞ্জাবির বোতামগুলো খোলা, চওড়া বুকে কাঁচাপাকা লোম।

শুভ্রার দিকে বুলবুলকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রসন্নভাবে বলল, আপ কি বেটী গির গ্যয়া...নদীর দিকে একা যেতে দেবেন না।

শুভ্রা বুলবুলকে কোলে নিয়ে কম্পিত গলায় বলল, আপনি ধ্যান করছিলেন। ও গিয়ে আপনাকে বিরক্ত করল...

লোকটি উদারভাবে হেসে বলল, না, না, ধ্যান-ট্যান কিছু করছিলাম না। এমনিই...রোদ্দুরের মধ্যে বসে থাকতে বেশ ভালো লাগে।

আমি লক্ষ্য করলাম, শুভ্রার শরীর তখনও কাঁপছে। হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি, আমি কথাবার্তা স্বাভাবিক করার জন্য বললাম, আপনি এখানে কতদিন আছেন? খুব চমৎকার জায়গা।

এরপর সাধারণ সৌজন্যমূলক কিছু কথা হলো। আমরা কী করে এলাম, রাস্তার অবস্থা কী রকম, এখানে খাবার দাবার পাওয়া খুব শক্ত...না, এখানে কোন বাঙালি তো নেই...

ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ফিরলাম। বুলবুলকে শুভ্রা কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে, সে আমার হাতের একটা আঙুল ধরে লাফাতে লাফাতে আসছে। একটু আগে সে বাপী বলে একজনের দিকে দৌড়েছিল, এখন তার কিন্তু কোন নৈরাশ্য নেই। সে আপনমনে আমাকে অনেক কথা বলে যাচ্ছে, আমি শুনছি না। আমি তার মাকে দেখছি।

শুভ্রার মুখ এখনো স্বাভাবিক নয়। দৃষ্টি উধাও ! সে আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, আমার খোঁজা শেষ হয়ে গেছে। আমি উত্তর পেয়ে গেছি...।

তারপরই সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কমলেশ—বলেই সে তার ডান বাহুতে মুখ চেপে হু-হু করে কাঁদতে লাগল।

বুলবুল আমাকে জিজ্ঞেস করল, মা কাঁদছে কেন? কী হয়েছে?

আমি উত্তর দিলাম না।

বুলবুল আমাকে ছেড়ে মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, মা, কাঁদছ কেন, মা ! বলো না? মা—

আমি বুঝতে পারলাম, এই প্রথম শুভ্রা তার স্বামীকে হারাবার শোকে কাঁদছে ! এ কান্না অভিমান বা অপমানের নয়। খাঁটি দুঃখের, কারণ সে নিজেই তার স্বামীকে মুক্তি দিয়েছে।

এই কান্নায় বাধা দেওয়া উচিত নয়। আমি একটু দূরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।
